হাওড়া

হাওড়া

তারাপদ সাঁতরা

১৪০৭

সুবর্ণরেখা

কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

'সুবর্ণরেখা' প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিচয় গ্রন্থমালার দ্বিতীয় বই 'হাওড়া'। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এটি কোন গবেষণামূলক বা বিস্তারিতভাবে আলোচিত গ্রন্থ নয়। আসলে এ গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে হাওড়া জেলা সম্পর্কিত প্রাথমিক পরিচয়সহ জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ। তাই আলোচ্য জেলাটি সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে রচিত এই গ্রন্থটি যদি পাঠকের আনুকূল্য লাভ করে, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

এ পুস্তকটি রচনায় আমি বহুজনের কাছেই কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি রচনাকালে একদা পরলোকগত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সম্পাদক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গতঃ শিল্পকলা ঐতিহাসবিদ্ ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, লোকান্তরিত গবেষক প্রবাল রায়-এর জ্ঞানদ সাহচর্য আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং বিষন্ন হৃদয়ে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়া, নানাবিধ তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য শ্রী তরুণ পাইন (গ্রন্থাগারিক ঃ পশ্চিমবঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার), শ্রী হরিপদ রায় (মহকুমা শাসক ঃ উলুবেড়িয়া), শ্রী অনুপ মতিলাল (মহকুমা শাসক ঃ হাওড়া সদর), ডঃ শিবেন্দু মান্না, শ্রী অশোককুমার জাসু, শ্রী মদনমোহন গরাই, অমিত রায় ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী প্রমুখের কাছে একান্তই কৃতজ্ঞ। এছাড়া মার্টিন রেলের দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রটি বিলেতের মিলস্ পেইন-এর তোলা এবং এটি শ্রী গৌরকুমার মৌলিকের সৌজন্যে পাওয়ায় তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। গ্রন্থটি সুচারুরূপে প্রকাশেব জন্য 'সুবর্ণরেখা'-র কর্ণধার ইন্দ্রনাথ মজুমদারকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

২. .২. ২০০০ **তারাপদ সাঁতরা**

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

হাওড়া জেলার লোক উৎসব (১৯৬২)

শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য (১৯৬৯)

হাওড়া জেলার পুবাকীর্তি (১৯৭৬)

বাংলার দারু-ভাস্কর্য (১৯৮০)

ছড়া-প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ (১৯৮১)

মন্দির লিপিতে বাংলার সমাজচিত্র (১৯৮৩)

পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ ঃ উত্তর মেদিনীপুর (১৯৮৭)

পুরাকীর্তি সমীক্ষা ঃ মেদিনীপুর (১৯৮৭)

উলুবেড়ের আদিপর্ব (১৯৯৬)

পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য ঃ মন্দির ও মসজিদ (১৯৯৮)

১

সাধারণ পরিচিতি

হাওড়া নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মতামত প্রচলিত । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার'-পুস্তকে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে, খানাখন্দ ও জলাভূমিকে পূর্ববঙ্গে 'হাওড়' বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এ জেলার ভূভাগও তেমন ধরনের ছিল বলে নামকরণ হয়েছে হাওড়া। অন্যদিকে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জে. বোনার্জী রচিত 'হাওড়া সিভিক কম্প্যানিয়ন' গ্রন্থের মতে, ওড়িয়া ভাষায় 'হাবোড়' শব্দের অর্থ — জলা। যেহেতু এ জেলার কিছু অংশ একদা ওড়িশার অধীন ছিল, সেজন্য ওই ওড়িয়া শব্দটি থেকেই বর্তমান হাওড়া নামের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রীষ্টীয় আঠার শতকে দিল্লীর বাদশাহ ফারুকসায়েরের সিংহাসন প্রাপ্তি উপলক্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল কাউন্সিল কলকাতার অপর তীরে যেসব মৌজার পত্তনী প্রার্থনা করেন তা হল, বোরো পাইকান পরগণার অন্তর্গত শালিকা, হাড়িড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর এবং বেতোড়। হাড়িড়া ছাড়া অন্য মৌজা নামগুলি এখনও প্রচলিত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি যখন এই হাড়িড়া মৌজায় রেল ষ্টেশনের পত্তন করেন, তখন থেকেই সে মৌজার নাম লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে হাওড়ায় পরিণত হয় এবং প্রান্তবর্তী এই ষ্টেশনের নামও করা হয় হাওড়া এবং সর্ববৃহৎ বা সদর শহরের নাম অনুরূপ দৃষ্টান্তের মত, জেলা ক্ষেত্রেও আরোপিত হয়।

প্রথমদিকে এই নামটি লিখিতভাবে কোন কোন স্থানে 'হাবড়া' বলে উল্লিখিত হয়। সম্ভবতঃ নামটির ইংরেজি বানানের মধ্যে 'ডাবলিউ' থাকায় শিক্ষিত জনেদের পক্ষে সেটি উত্তর ভারতীয় ভাষাভাষীদের অন্তস্থ 'ব' -এর উচ্চারণ 'ও' -এর বদলে 'ব' গৃহীত হওয়ায় এটি 'হাবড়া' রূপে উচ্চারিত হতে থাকে।

তবে নামটির বুৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে 'আড়া' - অন্ত বহু গ্রাম-নামের দেখা মেলে। এখানে 'আড়া' অর্থে বাসস্থান। অর্থাৎ পাল পদবীধারীরা যে 'আড়া' বা ডাঙ্গা বা বাঁধের পাড়ে বসবাস করেন, সে গ্রামের নামকরণ হয়েছে পালড়া। অনুরূপভাবে, সম্ভবতঃ হাঁড়া পদবীধারী বা হাড়ি সম্প্রদায়ের বসতির দরুণ 'হাড়িড়া' পল্লীর নাম কালক্রমে হাড়িড়া থেকে চলতি কথায় উচ্চারণগতভাবে 'হাইড়িয়া' এবং পরে 'হাইড়্যা' হয়ে হাওড়া নামে রূপান্তরিত হয়েছে।

এছাডা, হাওড়া নামের বুৎপত্তি বিষয়ে অন্য একটি সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রাম-নাম গবেষণায় একথা স্বীকৃত যে, অতীতে বাংলার অধিকাংশ গ্রাম-নামের সৃষ্টি হয়েছিল নানাবিধ বৃক্ষলতাকে কেন্দ্র করে। হাওড়া জেলার ক্ষেত্রেও আমরা জলজ শালুক গাছ থেকে শালিখা এবং কালকাসুন্দের গাছ থেকে কাসুন্দিয়া নামের যেমন বুৎপত্তি নির্ণয় করেছি, তেমনি ষোল শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত হরিড়া গাছের আধিক্যের জনা সেখানের সাবেক নামকরণ হয়েছিল হড়িড়া বা হাড়িড়া, যা পরে এই হাওড়া নামে রূপান্তরিত।

এ জেলাটি ২২°১২′৩০″ থেকে ২২°৪৬′ ৫৫″ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°২২′ ১০″ থেকে ৮৭°৫০′ ৪৫″ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জেলার সীমানা, উত্তরে হুগলী জেলার আরামবাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমা, দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা, পূর্বে

কলকাতাসহ উত্তর ২৪-পরগণা জেলার ব্যারাকপুর ও দক্ষিণ ২৪-পরগণার আলিপুর ও ডায়মন্ডহারবার মহকুমা এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও তমলুক মহকুমা সহ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার কিছু অংশ। আয়তনে এ জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট জেলা এবং 'সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র মতে (ভারতের ভূ সমীক্ষণ) এ জেলাটির আয়তন ৫৭৫ বর্গ মাইল, বর্তমানে ১,৪৬৭,০ বর্গ কি.মি. । ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী এ জেলার লোকসংখ্যা ৩৭,২৯,৬৪৪ জন।

প্রশাসনিক কারণে, হাওড়া জেলার সীমানা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ইংরেজ আধিপত্যের শুরুতে, বর্তমান হুগলী ও হাওড়া জেলার মোট এলাকা যুক্তভাবে ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। পরে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলা থেকে পৃথক করে, হাওড়া ও হুগলী জেলার মিলিত অংশ নিয়ে হুগলী জেলার সৃষ্টি হয় এবং নবগঠিত হুগলী জেলার কালেক্টরেট তখন বর্ধমানেই থাকে। আজকের হাওড়া জেলার বাগনান ও আমতা থানা এলাকা সে সময় ছিল হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত এবং সে সময়ের রাজাপুর (বর্তমান ডোমজুড় থানা), কোটরা (বর্তমান শ্যামপুর থানা) এবং উলুবেড়িয়া থানা ছিল ২৪-পরগণা জেলার এলাকাধীন। হাওড়া শহর এলাকাটি তৎকালীন রাজধানী কলকাতার অংশ বলে গণ্য হওয়ার কারণে সেখানকার যাবতীয় ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন ২৪-পরগণার জেলা শাসক ও জেলা জজ। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪-পরগণা থেকে উল্লিখিত রাজাপুর, কোটরা ও উলুবেড়িয়া থানা এলাকাকে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর হাওড়া শহরের উন্নতির জন্য, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলায় একজন স্বতন্ত্র জেলাশাসক নিযুক্ত হওয়ায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হুগলী জেলা শাসকের অধিকারের অবসান ঘটে। হাওড়ার প্রথম জেলা শাসক উইলিয়ম টেলর-এর এক্তিয়ারের সীমানা নির্দিষ্ট হয়, হাওড়া, শালকিয়া, আমতা, রাজাপুর (বর্তমানে ডোমজুড়), উলুবেড়িয়া, কোটরা (বর্তমানে শ্যামপুর) ও বাগনান থানা সমূহের এলাকা। বলা যেতে পারে যে, এরপর থেকেই হাওড়া জেলা মোটামুটিভাবে একটা আলাদা জেলায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সীমানায় সামান্য কিছু অদলবদলের পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে হাওড়া চূড়ান্তভাবে তার বর্তমান রূপ গ্রহণ করে।

পূর্বে এ জেলাটি ছিল বর্ধমান ডিভিশনেব মধ্যে, কিন্তু ১৯৬৩ সালে এটি প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জেলার মহকুমা ছিল দুটি, সদর ও উলুবেড়িয়া। বর্তমানে এ জেলায় থানার সংখ্যা মোট উনিশটি। তার মধ্যে সদর মহকুমার মোট থানার সংখ্যা বারোটি; যথা ঃ বালী, ব্যাঁটরা, ডোমজুড়, গোলাবাড়ি, হাওড়া, জগাছা, জগৎবল্লভপুর, মালীপাঁচঘরা, লিলুয়া, পাঁচলা, সাঁকরাইল ও শিবপুর। অন্যদিকে উলুবেড়িয়া মহকুমায় মোট থানার সংখ্যা সাতটি; যথাঃ উলুবেড়িয়া, আমতা, উদয়নারায়ণপুর, জয়পুর, বাউড়িয়া, বাগনান ও শ্যামপুর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, প্রশাসনিক কারণে পরবর্তী সময়ে সদর মহকুমার বাউড়িয়া থানাকে বিভক্ত করে বাউড়িয়া ও পাঁচলা থানা হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয়। অনুরূপ উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা থানাকেও দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যাব উত্তরবাংশটিব নাম হয় উদয়নারায়ণপুর। গত ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তারিখে আমতা থানাকে পুনরায় ভাগ করে পশ্চিমাংশটিতে নতুন করে জয়পুর থানা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

২

প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব

ক. **ভূ-প্রকৃতি ঃ** এ জেলার পূর্বপ্রান্তে হুগলী-ভাগীরথী নদী, পশ্চিমপ্রান্তে রূপনারায়ণ এবং জেলার মাঝামাঝি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে দামোদর নদ। ফলে স্বভাবতই এই নদনদী ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি দিয়ে বাহিত পলিমাটি এ জেলার ভূ-প্রকৃতি গঠনে সহায়তা করেছে। লক্ষ্য করা যায়, বন্যা রোধের জন্য এ জেলার নদনদীগুলির ধারে ধারে এক সময়ে বেশ উঁচু করে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে পলিমাটি জমতে থাকার দরুণ জেলার সমগ্র ভূমিতলের মধ্যে বেশ পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে উঁচুনিচু ভূ-ভাগে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে জেলার পুর্ব-পশ্চিম এলাকাটি উঁচু হয়ে পড়ায় মধ্যবর্তী অঞ্চলটি স্বভাবতই নীচু হয়ে যায়। এর ফলে বর্ষার সময় অতি সহজেই এই এলাকাটি প্লাবিত হয়ে পড়ে। মূলতঃ এ জেলার এক সময়ে সমস্যাই ছিল জল নিকাশের এবং এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমলে বেশ কিছু জলনিকাশী খালও খনন করা হয়েছিল। তাছাড়া জেলার মধ্যস্থলে দামোদর ও তার শাখা নদীগুলির প্রবাহ পরিবর্তন করার জন্যে জেলার স্থানে স্থানে বেশ কিছু অগভীর জলা বা ঝিলের সৃষ্টি হয়। সে সব নীচু জলাগুলির মধ্যে একটি হ'ল জেলার মধ্যস্থলে দক্ষিণ-পশ্চিম লাগোয়া বিখ্যাত কেঁদোর জলা, যার জলনিকাশে একদা বাইশ পটি বা বাঁশপাটি খাল খনন করা হয়েছিল। এ জেলার শাঁকরাইলের কাছে ভাগীরথী ও সরস্বতী নদীর মজা সংযোগস্থলের কাছে 'ফলতার বিল' নামে আরও একটি নীচু জলাভূমির অস্তিত্ব ছিল। হাওড়া জেলার আঠার শতকের মঙ্গলকাব্যের কবি হরিদেব রচিত 'রায় মঙ্গল' কাব্যে এ বিলটির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে মাকড়দহ ও বড়গাছিয়ার মধ্যস্থলে যে বিরাট জলাভূমিটি দেখা যায়, সেটির জলনিকাশে রাজাপুর ড্রেণেজ খালের ভূমিকা একান্তই উল্লেখযোগ্য।

এ জেলায় প্রবাহিত নদ-নদীর মধ্যে হুগলী-ভাগীরথীই প্রধান। এছাড়া জেলায় প্রবাহিত অন্য নদনদীগুলির মধ্যে রূপনারায়ণ, দামোদর ও সরস্বতী বলতে গেলে, পুর্বোক্ত হুগলী-ভাগীরথীরই উপনদী। জেলার পশ্চিম প্রান্ত বরাবর রূপনারায়ণ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গেঁওখালির কাছে, দামোদর ডিঙ্গেখোলার কাছে এবং সরস্বতী শাঁকরাইলের কাছে হুগলী-ভাগীরথীতে এসে মিলিত হয়েছে। দামোদর নদ একদা এ জেলায় বহুবার তার প্রবাহ পরিবর্তন করায়, সেটির শাখা প্রবাহগুলির নাম হয়ে যায় কানা দামোদর বা কৌশিকী এবং পুরাতন দামোদর বা মজা দামোদর। বর্তমানে যে সিজবেড়িয়ার খাল হুগলী-ভাগীরথীর সঙ্গে সংযোগ হয়েছে একদা এটি ছিল দামোদরের পুরাতন প্রবাহ পথ। সেজন্যই দামোদর ও সরস্বতীর পরিত্যক্ত প্রবাহপথের পাশাপাশিই দেখা যায় একদা সমৃদ্ধ বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম-জনপদ।

নদী ছাড়া স্বভাবতই এ জেলায় খালনালার সংখ্যাও অনেক। জেলার প্রধান খালগুলি হ'ল, বাঁশপাটি, হুড়হুড়া, মাদারিয়া, গাইঘাটা-বাকসী, ও ন'খালি প্রভৃতি। এছাড়া, মিঠেকুণ্ডু, গৌরীগঙ্গা, বালী, রাজগঞ্জ, শাঁকরাইল, সিজবেড়িয়া, মেদিনীপুর ক্যানেল ও চাঁপাখাল প্রভৃতি খাল যুক্ত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, হাওড়া জেলার সৃষ্টি হয়েছে নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে। সে

হিসেবে জেলার উত্তর-পশ্চিম ভূভাগটি দামোদরের পলি দিয়ে গঠিত, কিন্তু পূর্ব-দক্ষিণের অংশটি পলিমাটি দিয়ে গঠিত হ'লেও তাতে দেখা যায় নোনামাটির ভাগই বেশী। জেলার উত্তর অংশে সেজন্য কাদামাটির সঙ্গে ঘন দোআঁশ মাটির আধিক্য, কিন্তু দক্ষিণ অংশে দেখা যায় হালকা দোআঁশমাটি। মোটকথা বিভিন্ন মিশ্রণ অনুযায়ী এ জেলায় যে ধরনের মাটি দেখা যায় তা হল, এঁতেল, পাঁক এবং ধ্বসা বা জলযুক্ত মাটি।

খ. **জলবায়ু** ঃ এ জেলার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম ও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে সারা বছর ধরেই যথেষ্ট আর্দ্রতা। বঙ্গোপসাগর থেকে আগত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এ জেলা আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু মুলতঃ হয়ে পড়েছে মাঝারি ধরনের সামুদ্রিক জলবায়ুর মত। মোটামুটি চারটি ঋতুতে সারা বছরটিকে ভাগ করলে দেখা যায়, জেলায় গরমকাল শুরু হয় প্রধানতঃ মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের অর্ধেক পর্যন্ত। এই সময় আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত যে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় কালবোশেখী।

এরপর মে মাসের পর থেকেই সমুদ্র থেকে দক্ষিণের ঝোড়ো বাতাস বইতে থাকে এবং এক সময়ে সে হাওয়া বন্ধ হয়ে আবহাওয়া গুমোট হয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বজ্রপাত সহ অবিরাম বৃষ্টিপাত শুরু হয়, যা সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। জুলাই-অগাস্ট মাসে আর্দ্রতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সেপ্টেম্বর মাসের আবহাওয়া বেশ বিরক্তিকর হয়ে ওঠে অত্যধিক গরমের জন্য। সেজন্যে সাধারণভাবে এই সময়টাকে 'পচা ভাদ্র' বলা হয়ে থাকে। মৌসুমীর পরের ঋতু, অর্থাৎ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানকার জলহাওয়া বেশ আরামপ্রদ। তবে অক্টোবর মাস নাগাদ অনেক সময় বজ্রপাত সহ ঝড়বৃষ্টিও হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত শীতকাল। এ সময় মাঝে মাঝে বেশ কুয়াশা দেখা দেয়।

একদা সরস্বতী ও কানা দামোদর মজে যাওয়ার ফলে জল নিকাশ না হওয়ায় ম্যালেরিয়া বিস্তারের ফলে, জেলার উত্তর অঞ্চলের জনবসতি হ্রাস পায়। বর্তমানে হাওড়া শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে কলকারখানা বিস্তার ও ঘন বসতির জন্য সেখানকার অবস্থা যে খুবই শোচনীয় তা বলা বাহুল্য।

এ জেলার গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হল ১৫২০.১ মি.মি. (৫৯.৮৪´´ ইঃ) এবং জেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত সব জায়গায় অবশ্য সমান নয়, বেশ তারতম্য দেখা যায়। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে জেলার দক্ষিণ-পুব এলাকার চেয়ে উত্তর-পশ্চিম অংশেই বেশী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে মার্চ মাস থেকেই গরম পড়তে শুরু করে এবং এপ্রিল-মে মাসে সেই গরম একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। এই সময় গড় উষ্ণতার সর্বাধিক মাত্রা দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ সেঃ (৯৬.৮ ফাঃ) এবং সর্বনিম্ন মাত্রা হয় ২৪ সেঃ (৭৫.২ ফাঃ)। কোন কোন সময় স্থানে স্থানে এই তাপমাত্রা খুব বেশী বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৬ বা ৪৭ সেঃ (১১১.৮ বা ১১৬.৬ ফাঃ)।

গ. **বৃক্ষলতা** ঃ হাওড়া জেলায় এক 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোন গাছপালা দেখা যায় না। জেলার অনেকটা এলাকা জুড়ে ধান চাষ হওয়ার জন্য এখানে এমন কোন উল্লেখযোগ্য বনজঙ্গল নেই, যা থেকে এ জেলার বনজ সম্পদ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তাহলেও প্রতিটি গ্রামের ভেতর, রেললাইনের বা নদীর বাঁধের ধারে ধারে বিবিধ গাছপালার সঙ্গে অন্যান্য গুল্ম, ঝোপঝাড় ও আগাছা ইত্যাদির মধ্যে ঔষধি জাতীয় গাছপালাও লক্ষ করা যায়।

এ জেলায় সাধারণ প্রজাতির বৃক্ষরাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, দেশী বাদাম, পেয়ারা, গাব, নারিকেল, তেঁতুল, তাল, খেজুর, নিম, আম, লিচু, জারুল, জাম, সজনে, শিমুল, বকুল, বেল, কয়েৎবেল, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, চালতা, কাঁঠাল, মাদার, ছাতিম, দেবদারু, আমড়া, বাবলা প্রভৃতি। বাঁশঝাড়ও বেশ কিছু এ জেলায় দেখা যায়।

গুল্ম ও ঝোপঝাড় জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে বৈঁচ, আশশেওড়া, শেঁয়াকুল, চাকুন্দা, ফণীমনসা, কুকুরচূড়া, তুলসী, বাকস, মেহেদী, ভাঁট, তেশিরে মনসা, আকন্দ, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছগাছালির নাম করা যেতে পারে।

ঘন জঙ্গলে ঢাকা আগাছার মধ্যে এ জেলায় দেখা যায়, আমরুল শাক, বন চাঁড়াল, সেফুনে বা পুনর্নভা, পানিমরিচ, খিরুই, ঢোলাপটা বা জটাকাঁসিরা এবং বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস প্রভৃতি। লম্বা কাঠিযুক্ত প্রজাতির গাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুড়হুড়ে, মেরাদু, বারহালুনিয়া শাক, পাট, শন, দাদমারী, ককশিমা, চিরেতা, হাতীশুড়, কাঁটানটে, শ্বেতবসন্ত, ঘেঁটকচু ও কচু প্রভৃতির সঙ্গে, নানাবিধ ঘাস। এই প্রজাতির ঔষধি জাতীয় গাছ হল ঝুমকো, বনকাপাস, কালকাসুন্দা, আলই বা কালমেঘ ও লাল ভেরেণ্ডা প্রভৃতি।

লতানে জাতীয় গাছের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে, কুঁচ, ঝুমকো লতা, পান, বুনো বেলফুল, মল্লিকা, শিবঝুল, ভুঁইকুমড়ো, কলমী ও হিঞ্চে শাক, রাঙ্গাআলু ও চুবড়ি বা মেটে আলু প্রভৃতি।

ভাগীরথী নদীর তীরে জেলার দক্ষিণপূব সীমানা বরাবর কিছু কিছু গরাণ বা সুঁদরী জাতীয় প্রজাতির বৃক্ষ একসময় দেখা যেত। তবে আসল সুন্দরী বা গরাণ গাছ এ জেলায় এখন আর হয় না।

এ জেলায় বেশ কিছু পুকুর, ডোবা ও অন্যান্য ঝিল প্রভৃতির জন্যে জলজ উদ্ভিদের বেশ প্রাচুর্য দেখা যায়। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে, পানিলাজুক, শোলা, লজ্জাবতী, হোগলা, মাদুরকাঠি, কেশুর প্রভৃতি। বদ্ধ জলাশয়ে বিভিন্ন প্রকার পানা অর্থাৎ কচুরি পানা, বড পানা, গুঁড়ি পানা, টোকা পানা এবং নানা জাতীয় শ্যাওলা ও ঝাঁঝি জন্মে থাকে।

সম্প্রতি বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সরকারী উদ্যোগে জেলার নানাস্থানে রাস্তার ধারে ধারে এবং পতিত জায়গায় বেশ কিছু বনজ উদ্ভিদ রোপণ করা হয়েছে। জেলার নানা স্থানে বিশেষ করে পশ্চিম অংশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি নার্সারীও নানাবিধ ফল-ফুলের কলম - চারা সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া জেলার পশ্চিম অংশে ব্যাপকভাবে অর্থকরী ফসল হিসাবে ফুল চাষ এবং জেলার উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে রবিশস্য চাষ হয়ে থাকে।

ঘ. ভূ-তাত্ত্বিক বিবরণ ঃ ভূপ্রকৃতিগতভাবে এই জেলাটি, বাংলা অববাহিকার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বদেশে এক অপরিবর্তনশীল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মাটির ভিতরে এ জেলার সে শিলাস্তরটি কোন এক শক্ত ও পুরু কষ্টিপাথরের স্তরের ও পাললিক গঠনক্রমের মধ্যে সমাহিত। তবে জেলার উপরিভাগ পলিমাটি দিয়ে গঠিত। ১৯৩৫-৪০ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার মাটির তলায় পরীক্ষামূলকভাবে খননকালে ৪৩৯ ফুট গভীরে কোন পাথুরে ভিত্তি বা সামুদ্রিক স্তর পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে পৃষ্ঠদেশ থেকে তিরিশ ফুট নীচে গাছপালার অবশেষ পাওয়ায় মনে করা যায় যে ঐ স্থানটিই ছিল প্রাচীন ভূমিপৃষ্ঠ। এ ছাড়া আরও গভীরে ৩৮০ ফুট নীচে মিঠে জলেব প্রাণীর হাড়গোড় ও অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড পাওয়ায় অনুমান করা যেতে পারে যে, ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে হাওড়া জেলার এই ভূভাগটি গঠিত হয়েছে। সেজন্য দেখা যায়, জেলার উত্তর-পশ্চিম এলাকা অর্থাৎ উদয়নারায়ণপুর ও আমতা থানার ভূভাগ দামোদরের স্রোতধারায় বাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত। দক্ষিণের অর্ধভাগ, অর্থাৎ গোটা শ্যামপুর থানা এবং বাগনান, উলুবেড়িয়া ও পাঁচলা থানার কতকাংশ আবার নোনাযুক্ত পলিমাটির দ্বারা গঠিত। পূবের অংশ, অর্থাৎ, সমগ্র বালী, মালীপাঁচঘরা, গোলাবাড়ি, হাওড়া, শিবপুর, ব্যাঁটরা, জগাছা, ডোমজুড় ও শাঁকরাইল এবং জগৎবল্লভপুর থানার বেশ কিছু অংশ গঙ্গার নিম্নভূমির মাটি দিয়ে এবং জেলার অবশিষ্ট অংশ দামোদরের চরভূমি নিয়ে গঠিত।

খনিজ সম্পদের দিক থেকে এ জেলায় তেমন কিছু না থাকলেও পলিমাটি দিয়ে গঠিত সমতলভূমি কৃষিকাজের পক্ষে বেশ উপযোগী। তাছাড়া এই ধরনের মাটি সহজলভ্য বলে এ জেলায় মাটির হাঁড়িকুড়ি ও ঘর ছাইবার পোড়ানো টালী প্রভৃতি তৈরীর মৃৎশিল্পটি বেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। এছাড়া পাকাবাড়ি নির্মাণে গাঁথনির জন্য এখানে বালিও অফুরন্ত পাওয়া যায়। মাটির তলায় ৭.৫মি. থেকে ৫৫মি. পর্যন্ত যে মিহি বালি পাওয়া যায় তার রঙ হলদে ও অভ্রের ভাগ বেশি এবং এটির বিস্তার ৭৬ মি. পর্যন্ত। তার পরেই গভীরে অবস্থিত মাটিটির রঙ্ কালো। সম্প্রতিকালে ইন্ডো-স্টানভ্যাক পেট্রোলিয়াম প্রোজেক্ট-এর পক্ষে ভূ-গর্ভে যে অনুসন্ধান ও সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়, তার ফলে জানা গেছে যে, প্যালিওসীন এবং নিম্ন ইয়োসিন যুগের বালীর স্তরে চুনাপাথরের উপর চাপানো কিছু কিছু পেট্রোল ও গ্যাস রয়েছে। কিন্তু তা হলেও বাণিজ্যিকভাবে সে সব কাজে লাগানোয় অসুবিধে। পরবর্তীকালে ভারত ও রাশিয়ার খনিজ তৈল প্রযুক্তিবিদরা মাটির তলায় বহুদিন ধরে জমে থাকা উদ্ভিজ পদার্থ থেকে রূপান্তরিত এমন এক খনিজ জ্বালানীর সন্ধান পেয়েছেন যা কয়লায় রূপান্তরিত হওয়ার এক প্রাথমিক পর্যায়। কিন্তু এই খনিজ পদার্থটির বাণিজ্যিক সদ্‌ব্যবহার সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা করা হয়নি।

এ জেলার মাটির তলায় ৪৬ থেকে ১৩৭ মিটার গভীরে মোটা থেকে মিহি দানা বালিতে, কখনও বা বালি মিশ্রিত নুড়িতে জলের স্তর পাওয়া যায়। তবে জেলার ভূগর্ভস্থ জলের স্তর সর্বত্র সমান নয়। জেলার উত্তরাঞ্চলে ১৪ থেকে ৩০ মিটার গভীবে মিঠা জলের স্তর পাওয়া গেলেও, জেলার দক্ষিণ ভূভাগে ঐ গভীরতায় যে জল পাওয়া যায় তা লবণাক্ত। কিন্তু ঐ সব স্থানের ২০০ থেকে ২৫০ মিটার গভীরে স্বাদু জলের সন্ধান পাওয়া যায়।

৩

প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ ও ইতিহাস

হাওড়া জেলায় পাল-সেন আমলে যে বহু পাথরের মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার প্রমাণ হিসাবে এ জেলার নদীতীরবর্তী স্থানে বেশ কিছু প্রস্তর-ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখা যায়। সেসব নিদর্শনের মধ্যে পাথরের মন্দিরে ব্যবহৃত মন্দিরের বিভিন্ন অংশ, যথা দ্বারপার্শ্ব, দ্বারশীর্ষ, অঙ্গশিখর, রথপগযুক্ত দেওয়ালের বেশ কিছু খণ্ডাংশ প্রভৃতি বেশ উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি দ্বারশীর্ষে গণেশ, 'গণ' বা 'প্রমথ'র মূর্তি এবং 'পত্রলতা' ক্ষোদিত দেখা যায়। উলুবেড়িয়ার কাছে ভাগীরথীতীরবর্তী মিঠেকুণ্ডু গ্রামে পাওয়া কোন বিশালায়তন প্রাচীন মন্দিরে ব্যবহৃত দ্বারশীর্ষের মধ্যস্থলে উৎকীর্ণ এক কীর্তিমুখের ভগ্নাংশ বাগনান-নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে। এছাড়া বাঁকড়া গ্রামে একদা প্রতিষ্ঠিত এক প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশপথের উপরিভাগে প্রথাগতভাবে নিবদ্ধ একটি নবগ্রহ মূর্তি ফলকও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও খড়িয়প, জয়পুর, দেউলী, পারগুস্তিয়া, পিছলদহ, পোলগুস্তিয়া, বালীটিকুরী, বৈঁচি, যদুরবেড়ে, সাতমহল, মেল্লক, কুলটিকুরী প্রভৃতি স্থানেও এ জাতীয় নানাবিধ পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাচীন মন্দিরে ব্যবহৃত এসব বিভিন্ন অংশ ছাড়াও এ জেলায় বেশ কিছু মূর্তি-ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ জেলার শ্যামপুর থানার বাছরী গ্রামের দমদমা ঢিবির আশপাশে পাওয়া প্রস্তর ভাস্কর্যের মধ্যে আছে বিষ্ণুমূর্তির ভগানংশ, বিষ্ণুপট্ট ও মূর্তি সংস্থাপনের জন্য প্রস্তর নির্মিত পাদপীঠ প্রভৃতি, যেগুলি ভাস্কর্য শৈলী বিচারে খ্রীষ্টীয় দশ-বারো শতকের প্রাচীন বলে গণ্য করা যেতে পারে। এছাড়া আলোচ্য থানার এলাকাধীন নুনেবাড় গ্রামে পঞ্চানন্দ নামে পূজিত খ্রীষ্টীয় বারো-তের শতকের ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি, দেউলী হাটে কাত্যায়নী নামে পুজিত কতকগুলি প্রাচীন মূর্তির এবং কোন বিস্মৃত মন্দিরে ব্যবহৃত দ্বারপার্শ্বের ভগ্নাংশ, বৈঁচি গ্রামে কোন প্রাচীন মন্দিরে দ্বারপাল হিসাবে ব্যবহৃত এ·ং এখন দক্ষিণরায় জ্ঞানে উপাসিত মূর্তি প্রভৃতিও জেলার প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে।

বাগনান থান্না এলাকায় রূপনারায়ণ তীরবর্তী কিছু স্থানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ন-ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সে সব স্থানের মধ্যে হরিনারায়ণপুর গ্রামে খ্রীষ্টীয় বার-তের শতকের দুটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি ছাড়াও কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার আদিমধর্মী সাত-আট শতকের বিষ্ণুমূর্তি ক্ষোদিত প্রস্তরফলকও পাওয়া গেছে। এই সঙ্গে প্রাপ্ত আনুমানিক এগারো-বারো শতকের একটি ক্ষুদ্রাকার পাথরের মহিষমর্দিনী মূর্তির লাবণ্যমণ্ডিত ভাস্কর্যটি সৌন্দর্যে প্রোজ্জ্বল। আলোচ্য এ গ্রামটির পার্শ্ববর্তী বাঁটুল গ্রামেও বারো-তের শতকের একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। এ থানা এলাকার মেল্লক গ্রামের মদনগোপালজীউর মন্দিরের অলিন্দে রক্ষিত বিষ্ণু মূর্তিটিও নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের। পাশের সামতা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটিও সমকালীন বলে অনুমিত হলেও সেটিতে ওড়িশার মূর্তি-ভাস্কর্যশৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মানকুর গ্রামে যে চামুণ্ডা মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের হওয়া সম্ভব এবং এখানে যে একদা শাক্ত উপাসনার কোন এক বৃহৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তার নিদর্শন হিসাবে এখানকার 'সপ্তমাতৃকার' থানে পূজিত কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্যের অংশ একান্তই উল্লেখযোগ্য। খালোড় গ্রামের কালীমন্দিরের

পাশে ধর্মঠাকুরের থানে অনেকগুলি কূর্মমূর্তির সঙ্গে পাল-শৈলীর পাথরের একটি ছোট বিষ্ণুমূর্তি ও শাক্ত চামুণ্ডা মূর্তি, বাইনান গ্রামে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের ভগ্ন সূর্যমূর্তি প্রভৃতিও এই থানা এলাকার প্রস্তর ভাস্কর্যের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

আমতা থানায় দামোদর তীরবর্তী মেলাই চণ্ডীর মন্দিরে রক্ষিত পাথরের একটি ভাস্কর্য ফলক এবং স্থানীয় বাজার এলাকায় পঞ্চানন্দ জ্ঞানে পূজিত খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের মুণ্ডহীন এক বিষ্ণুমূর্তি, জয়পুর গ্রামের জলেশ্বর শিবমন্দিরে রক্ষিত খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের একটি অভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি এবং কোন এক প্রাচীন মন্দিরের পাথরের দ্বারপার্শ্ব ও দ্বারশীর্ষ, খড়িয়প গ্রামের গণেশমূর্তিযুক্ত পাথরের দ্বারশীর্ষ এবং রসপুর গ্রামের গড়চণ্ডীর মন্দিরে রক্ষিত ও একান্ত বিরল এগারো-বারো শতকের পাথরের মনসা মূর্তিটি এ জেলার মূর্তি-ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

এছাড়া কৌশিকী উপত্যকায় অবস্থিত তেলিহাটি গ্রামে বালি খননকালে আবিষ্কৃত পাথরের ছোট একটি উমামহেশ্বর মূর্তি, উভয় পৃষ্ঠে ভাস্কর্যক্ষোদিত বিষ্ণুপট্ট ও বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ প্রভৃতি পুরাবস্তুর গঠনশৈলী খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের বলেই অনুমিত। একই এলাকার চাঁদুল, নিজবালিয়া, চোঙঘুরালি, মাড়ঘুরালি প্রভৃতি গ্রামে প্রাপ্ত পাল-সেন আমলের পাথরের বিষ্ণুমূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুমূর্তি ছাড়া নিজবালিয়া এলাকা থেকে সূর্যমূর্তির এক ভগ্নাংশও সম্প্রতি পাওয়া গেছে। অতএব খ্রীষ্টীয় দশ-তের শতকে কৌশিকী উপত্যকায় অবস্থিত এইসব প্রাচীন মূর্তি-ভাস্কর্য এই এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে একান্তই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ জেলার পূর্বাঞ্চলে, প্রাচীন বেতড়ের কাছে, ভাগীরথীর সঙ্গে একদা যুক্ত সরস্বতী উপত্যকাতেও পাথরের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বাঁকড়া গ্রামের খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের একটি ভগ্ন নবগ্রহ-ভাস্কর্যের বিববণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে এবং বালীটিকুরী গ্রামে অনুরূপ প্রাচীন এক বিষ্ণুমূর্তি ও উত্তর ঝাঁপড়দহে অর্বাচীন চামুণ্ডা মূর্তি প্রভৃতিও পাওয়া গেছে।

ভাগীরথী তীরবর্তী প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে বালী গ্রামের কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে রক্ষিত খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের দুটি বিষ্ণুমূর্তি, উলুবেড়িয়া থানার মিঠেকুণ্ডু, যদুরবেড় ও সাতমহল গ্রামে আবিষ্কৃত পাথরের বহু প্রাচীন মন্দিরাংশ প্রভৃতি এ অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়।

হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এসব মূর্তিভাস্কর্যের নিদর্শন একদিকে যেমন এ জেলার প্রাচীনত্ব সূচিত করে, অন্যদিকে সমসাময়িক কালের সামাজিক ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত তথ্য উপস্থাপনে একান্তই সহায়ক বলে গণ্য হতে পারে। পাল আমলের বেশ কিছু মূর্তি প্রাপ্তিতে অনুমান করা যায় যে, অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু মহাযানী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের উপাসিত কোন বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি এখানে পাওয়া যায়নি। এছাড়া এসব প্রাচীন মূর্তি সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বাসুদেব-বিষ্ণু উপাসনার নজির এ জেলায় এত বেশী যে, সন্দেহ হয় এই ভূভাগ মহাযানী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের শাসন বহির্ভূত ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত উৎখননের সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না।

অধিকন্তু এসব পুরাতাত্ত্বিক পাথুরে প্রমাণ ছাড়াও হাওড়া জেলার প্রাচীনত্ব বিচারে, অদ্যাবধি সংগৃহীত বিবিধ প্রমাণের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, আজকের হাওড়া জেলার ভূভাগ প্রাচীনকালের 'লাঢ়' (রাঢ়), সুক্ষ্ম বা তাম্রলিপ্তি জনপদ বিভাগের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন বঙ্গের জনপদ বিভাগের মধ্যে রাঢ় ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সম্ভবতঃ প্রাচীনতর। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্তে' তীর্থঙ্কর মহাবীরের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে 'লাঢ়' দেশের 'বজ্জ' ও 'সুব্ব' ভূমিতে পরিভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'আচারাঙ্গ সূত্তে'র 'লাঢ়' যে প্রাচীন বঙ্গের রাঢ় অঞ্চল তাতে সন্দেহ নেই। সেকালের পশ্চিমবঙ্গ এলাকার জঙ্গলাকীর্ণ, কঙ্করময় প্রদেশেকে পণ্ডিতেরা 'বজ্জভূমি' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 'সুব্ব'ভূমির নাম শুধু 'আচারাঙ্গ সূত্তে'ই উল্লিখিত হয়নি, জৈন ধর্মগ্রন্থ 'কল্পসূত্র' ও 'ভগবতীসূত্রে'ও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যদিকে, বৌদ্ধ জাতকের গল্পে 'সুম্ভে'র অন্তর্গত 'দেশক' নামে যে নগরের কথা আছে, তা পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'সংযুক্ত নিকায়'তেও সুম্ভ দেশের মধ্যে 'সেতক' বা 'সৈধক' নামে এক শহরের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। জৈনদের 'সুব্ব'ভূমি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে বর্ণিত সুক্ষ্মকেই সনাক্ত করে। গুপ্তযুগে, বর্তমান আকারে সংকলিত, কর্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও সুহ্ম অঞ্চলের উল্লেখ আছে। মগধের পূর্বে, নেপালের দক্ষিণে, লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে এবং সমুদ্রতীরে জনবসতির নাম সুক্ষ্ম বলে বর্ণিত হয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা পাণ্ডববীর ভীমের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সুক্ষ্মবাসীদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। বরাহমিহির রচিত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের 'বৃহৎসংহিতা'য় সুক্ষ্ম এক পশ্চিমপ্রত্যন্ত প্রদেশরূপে উল্লিখিত, যা সমকালীন 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'ও সমর্থিত। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর খ্রীষ্টীয় বারো শতকের রচনা 'পবন দূতম্'-এ গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে সুক্ষ্মের অবস্থিতির উল্লেখ দেখা যায়। এসব সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন— গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ হুগলীর বেশ কিছু এলাকা এবং হাওড়া জেলাই প্রাচীন সুক্ষ্ম, যা পরবর্তীকালে মোটামুটিভাবে দক্ষিণ রাঢ় নামে চিহ্নিত হয়েছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকান্তের মতে এই সুক্ষ্মই হল রাঢ় এবং সেটি সমার্থক। সুতরাং এ থেকে মনে হয়, সম্ভবতঃ কোন সময় এই সুক্ষ্ম সভ্যতার প্রভাবসীমা একদা সমগ্র রাঢ়েই বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

অন্যদিকে জৈনধর্মগ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপন'-এ বঙ্গের এক বৃহৎ অংশ নিয়ে গঠিত 'তাম্রলিপ্তে'র উল্লেখ পাওয়া যায়, যা পৌরাণিক বিবরণ অনুসারে, 'তাম্রলিপ্তিক' নামে এক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত স্বাধীন রাজ্য হিসাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দণ্ডীণ রচিত 'দশকুমার চরিতে'র মতে সুক্ষ্মের প্রভাব দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তিতেও বিস্তৃত হয়েছিল। সুতরাং, এ থেকে মনে হয়, সমুদ্র বন্দর তাম্রলিপ্ত তার সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে ভিন্ন রাজ্যে গঠিত হলেও তা সুক্ষ্মের দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্গত ছিল; আবার বৃহত্তর রাঢ়াভূমির দক্ষিণবর্তী এলাকা এই সুহ্মভূমির অংশ হিসেবেই পরিচিত ছিল। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, আজকের হাওড়া জেলার এক বৃহৎ অংশ সুক্ষ্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরীও

বলেছেন, প্রাচীনকালে রাঢ় দেশের যে অংশ সুক্ষ্ম নামে পরিচিত ছিল, তা সম্ভবতঃ রাঢ়ের দক্ষিণাংশ বা বর্তমানের হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলাকেই সূচিত করে।

খ্রীষ্টীয় এগার শতকের তিরুমালাই শিলালিপি থেকে জানা যায়, রাজেন্দ্র চোল ওড্ড-বিষয় এবং কোশলৈনাড়ু (দক্ষিণ কোশল) অধিকারের পর ধর্মপালকে পরাজিত করে তণ্ডবুত্তি বা দাণ্ডভুক্তি (বর্তমানের দাঁতন), তক্কন-লাঢ়মের রণাসুর (যা সম্ভবতঃ অপার মান্দারের বা আজকের হুগলী জেলার গোঘাট থানার গড়-মান্দারণের শূর রাজাদের রাজ্য হিসাবে খ্যাত ছিল) এবং বঙ্গ অধিকার করে ছিলেন। এ শিলালিপির বর্ণনা থেকে স্পষ্ট ধারণা হয়, দণ্ডভুক্তি ও বঙ্গের মধ্যস্থলবর্তী রাষ্ট্রই ছিল তক্কন-লাঢ়ম বা দক্ষিণ-রাঢ়।

দক্ষিণ রাঢ় বা সুক্ষ্মের অন্তর্গত আজকের হাওড়া জেলা এলাকার অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ দিকে রচিত ভট্ট শ্রীধরাচার্যের 'ন্যায়-কন্দলী' গ্রন্থে। সেখানে লেখক তাঁর ভণিতায় (আত্মপরিচয়ে) বলেছেন ঃ

"আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ।।"

দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠির এই ব্রাহ্মণসমাজের কৌলীন্য ও বিদ্যার অহংকার এমনই তুঙ্গে পৌঁছেছিল যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের চান্দেলরাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর বিখ্যাত 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁদেরই আদলে অঙ্কিত করেছিলেন। 'ভূরিসৃষ্টি' বা 'ভূরিশ্রেষ্ঠিক' গ্রাম জনপদই বর্তমান হাওড়া জেলায় ভুরশুট নামে পরিচিত। সুতরাং এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের অধিকাংশ ভূভাগই ছিল দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত।

সান্ধ্যকর নন্দী রচিত 'রামচরিতে'ও দেখা যায় যে, উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহী ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে সে সময়ে যাঁরা রামপালের সুহৃদ ছিলেন, তারা হলেন অপারমন্দারের রাজা লক্ষ্মীশূর এবং দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ। হরেকৃষ্ণ মহাতবের 'হিস্ট্রি অভ্ ওড়িশা'তে বলা হয়েছে, কেন্দুয়া পাটনা, পাঞ্জাবী মঠ এবং শঙ্করানন্দ মঠে রক্ষিত তাম্রপট্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় বারো শতকে রামপালের পুত্র কুমারপালের দুর্বলতার সুযোগে ওড়িশার অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ রাঢ় আক্রমণ করে গঙ্গাতীরবর্তী মান্দারের রাজাকে পরাস্ত করেন। এই মান্দারই হল শূর রাজাদের রাজ্য অপারমন্দার যা আজকের গড়-মান্দারণ।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুরাতন হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারের মতে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা-পঞ্জী'র বিবরণ অনুসারে, ওড়িশার পরবর্তী নৃপতি অনঙ্গভীমদেব রাঢ় দেশের দামোদর তীর পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত করেন। অর্থাৎ, বর্তমান হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা এলাকা পর্যন্ত যে এই বিজয় অভিযান প্রসারিত হয়েছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। অতএব মুসলমান আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চল ওড়িশার অধীনস্থই থাকে।

সেন রাজবংশের বিজয়সেন একদা হাওড়া এলাকাসহ সমগ্র বাংলায় তার আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্যদিকে, বারাকপুর তাম্রশাসন অনুসারে, বিজয়সেন অপার-মন্দারের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন। সুতরাং মনে হয়, হুগলী জেলার মান্দারণ এলাকার শূর নৃপতিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায়, হুগলী জেলার

সংলগ্ন অদূরের হাওড়া জেলা অঞ্চলেও বিজয়সেনের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। ২৪-পরগণার গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত লক্ষণসেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে যে, বর্ধমানভুক্তি গঙ্গা (ভাগীরথী) ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আঞ্চলিক স্তরবিন্যাসে 'বিষয়', 'মণ্ডল', 'খটিক', 'চতুরক' এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল। বর্ধমানভুক্তির মধ্যে কোন এক বিড্ডারশাসন গ্রাম পশ্চিম-খটিকার অংশ বেতড্ড্-চতুরকের মধ্যে অবস্থিত ছিল। বর্ধমানভুক্তি যে সেন রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূভাগ ছিল, তার প্রমাণ মেলে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটি গ্রামে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রপট্টলিপি থেকে। সেকালের বেতড্ড্-চতুরকই যে আজকের বেতড়, সে সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্তের মতে, '... বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড্চতুরক নামক বিভাগ, পূর্বদিকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড্ নামক স্থান এবং উহারই নামানুসারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।'

খ্রীষ্টীয় তের শতকের প্রথমে বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক লক্ষণসেনের রাজধানী অধিকারের সঙ্গে দক্ষিণ রাঢ় মুসলমান অধিকৃত এলাকায় পরিণত হলেও সেখানে নতুন শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় হতে বেশ কিছুকাল সময় লাগে। পনের শতকের শেষ দিকে হুসেন শাহের সমগ্র বাংলা বিহার অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কেন না ষোল শতকের মধ্যভাগে ওড়িশারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দন বাংলা আক্রমণ করে বর্তমান হাওড়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ সহ হুগলীর ত্রিবেণী পর্যন্ত দখল করে নেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতান সুলেমান করনানী মুকুন্দদেবকে বিতাড়িত করে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত ওড়িশা এলাকা অধিকার করেন। সুলেমান করনানীর রাজত্বকালে, রাজস্ব আদায়ের মহল হিসাবে হাওড়া জেলার এক বিস্তৃত অংশ সমেত যে নতুন বিভাগ গঠিত হয়, সুলেমান করনানীর নামানুসারে মৃত্যুর পর, তার নাম হয় সুলিয়ামানাবাদ। সুলেমানের পুত্র দায়ুদ করনানীর মৃত্যুর পর, সমগ্র বঙ্গদেশ কার্যতঃ মোগল বাদশাহ আকবরের শাসনে আসে এবং ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তোডরমলের রাজস্ব এলাকা বিভাগের কালে বর্তমান হাওড়া জেলার সমুদয় অংশ সুবা বাংলার যে তিনটি 'সরকারের' মধ্যে বিভক্ত করা হয় সেগুলি হল, সাতগাঁ, সুলিয়ামানাবাদ এবং মান্দারণ। সরকার সাতগাঁর অন্তর্ভুক্ত মহলগুলির নাম পুড়া (পরবর্তীকালের বোরো পরগণা, যার মধ্যে বর্তমান হাওড়া শহরের অবস্থিতি), বালিয়া ও খাড়োর (বর্তমানের খালোড়) পরগণা, আর সরকার সুলিয়ামানাবাদের মধ্যে পড়ে বসেন্ধরী, ভোসাট (ভূরশুট) ও ধাড়সা পরগণা এবং মান্দারণ সরকারের অন্তর্গত হয় মণ্ডলঘাট পরগণা।

শেষ মধ্যযুগে হাওড়া জেলার বিস্তৃত ইতিহাস না জানা গেলেও, সেকালের মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে এবং সমকালীন কিছু বিদেশী ভ্রমণকারীর বৃত্তান্তে ও মানচিত্রে এ জেলার কতকগুলি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য 'চৈতন্যমঙ্গলে'র মতে, নীলাচল যাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরের কাছে ভাগীরথী পার হয়ে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা ও কুলীনগ্রাম অতিক্রম করে দামোদর পার হবার আগে হাওড়া-হুগলীর সীমানায় অবস্থিত শিয়াখালায় উপস্থিত হন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হয়েছে, শ্রীচৈতন্যদেব তাম্রলিপ্ত যাবার পথে পিছলদহে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় পনেরো শতকের শেষভাগে রচিত

বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' চাঁদ সদাগরের বর্ধমান থেকে সমুদ্রযাত্রাপথের তীরবর্তী গ্রামগুলির মধ্যে এ জেলার ঘুসুড়ি ও বেতড়ের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'ও আমতার মেলাইচণ্ডী ও বালী গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকের মধ্যভাগে অঙ্কিত ডি-বারোসের মানচিত্রে দামোদর ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী স্থানে প্রদর্শিত 'পিসাকুলি' নামক স্থানটিকে ঠিক সনাক্ত করা যায়নি। আবার সতেরো শতকের দ্বিতীয়ভাগে প্রস্তুত মানচিত্রে এ স্থান-নামটি উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ডিবারোস 'পিসল্‌তা' এবং গ্যাস্টলডি 'পিকলদা' নামে যে জায়গার উল্লেখ করেছেন, তা আজকের পিছলদহ বলেই সাব্যস্ত হয়েছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুরাতন হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে সিজার ফ্রেডারিকের এক ভ্রমণবৃত্তান্ত উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সরস্বতী নদীর অগভীরতার জন্য সপ্তগ্রাম বন্দরের সঙ্গে পূর্বতন যোগাযোগ রক্ষা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলে ভাগীরথী তীরবর্তী বেতড় বিদেশী বণিক্‌দের ব্যবসাবাণিজ্যের এক অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। মূলতঃ এই ব্যবসা-বাণিজ্যে সে সময় পর্তুগীজরা ছিল একচেটিয়া এবং ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরাও অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। সুতরাং এই কেন্দ্রে যোগান অব্যাহত রাখবার জন্য একদিকে যেমন কৃষিকার্যের প্রসার ঘটে, অন্যদিকে তেমনই ভাগীরথী তীরবর্তী হাওড়া ও হুগলী জেলায় তাঁতী ও অন্যান্য কুটিরশিল্পীদের কেন্দ্রীভূত বসবাস ত্বরান্বিত হয়। এইভাবে নদী ও সমুদ্রপথে অর্থকরী পণ্যের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় জলদস্যুদের আক্রমণ সুরু হয়। এই মগ দস্যুদের প্রতিহত করবার জন্য তৎকালীন মুসলমান শাসকেরা ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বর্তমান মেটিয়াবুরুজের বিপরীতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে এক দুর্গ নির্মাণ করেন, যা থানামাকুয়া কেল্লা নামে পরিচিত হয়।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভ্যানডেন ব্রুকের তৈরী মানচিত্রে এই স্থানটিকে থানা কিল্লা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের স্ট্রিনশ্যাম মাষ্টার তাঁর ডাইরীতেও এটিকে তানা দুর্গ নামে উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি এই দুর্গটি সম্পর্কে যামিনীমোহন ঘোষ তাঁর লেখা 'মগ রেডার্স ইন বেঙ্গল' পুস্তকে লিখেছেন যে, মোগল আমলে এই দুর্গটি নির্মাণের যে প্রচলিত মতামত আছে তা সঠিক নয়। আসলে এটি নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় পনের শতকে বাংলার স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহেব আমলে। পরবর্তীকালে থানা মাকুয়া কেল্লা পাকাপোক্তভাবে নির্মিত হয় এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজবা মগদস্যু নিবারণের জন্য আড়াআড়িভাবে একটি লোহার শিকল ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। খ্রীষ্টীয় সতের ও আঠার শতকে ইউরোপীয় লেখকদের নানা লেখায় এই দুর্গটি সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বেশ বোঝা যায়, প্রথম দিকে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব বাহিনীর সংঘর্ষের সময়ে এ দুর্গটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

মোগল রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে এ জেলার ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ইংরেজ বণিক্‌দের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয় হুগলীতে। কিন্তু বাংলার তৎকালীন সুবেদার শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে বিরোধের ফলে হুগলী-কুঠির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জোব চার্নক সসৈন্যে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে সুতানুটিতে এসে আশ্রয় নেন। কিন্তু মোগল সৈন্যবাহিনী সেখানেও তাঁদের পিছু ধাওয়া করলে তাঁরা পালিয়ে যান হিজলীর দিকে। এই পশ্চাদপসরণের

সময় ইংরেজরা মোগলদের অধিকার থেকে এই তানা দুর্গ দখল করে নেয় এবং ভাগীরথীর দুই তীরে অবস্থিত মোগলদের বহু শস্য ও লবণ গোলায় আগুন ধরিয়ে দেয় ও সেইসঙ্গে বেশ কিছু রণতরী ও বাণিজ্য জাহাজও ধ্বংস করে দেয়। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি হিজলীতে শায়েস্তা খাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে এক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইংরেজদের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তাতে ইংরেজরা হিজলী থেকে সরে এসে উলুবেড়িয়াতে জাহাজ সারানোর কারখানা নির্মাণের অনুমতি পেলেও তাদের তানা দুর্গে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই চুক্তি অনুসারে চার্নক ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন উলুবেড়িয়াতে এসে পৌছান এবং সেখান থেকেই মোগল শাসন কর্তাদের অনুমতি নিয়ে ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আবার সুতানুটি এসে পৌছান।

এ বিষয়ে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে মিঃ ব্রম-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, চার্নকের রণতরী এমনই বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, সেগুলি মেরামতের জন্যে তাকে তিন চার মাস ঐ উলুবেড়িয়াতেই থাকতে হয়েছিল। যাই হোক, উলুবেড়ে থাকাকালে চার্ণক প্রথমেই সুপারিশ করেন যে, উলুবেড়িয়াতেই ইংরজ ঘাঁটি তৈরী হোক্। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটিকে যোগ্যতর মনে করায় জোব চার্নক শেষ অবধি ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগাষ্ট সদলে সুতানুটিতেই ফিরে আসেন। বলতে গেলে, এই তারিখটিই হল কলকাতা মহানগরীর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার দিন। সুতরাং জোব চার্ণকের সুতানুটিতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর না হলে হয়তো কলকাতার বদলে উলুবেড়িয়াই হত সে সময়ের ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের রাজধানী।

এ ঘটনার ছ'বছর পরে. মেদিনীপুরের চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে বর্ধমানরাজকে হত্যা করে। এর পরে সুতানুটি পর্যন্ত দখল কায়েম করে গঙ্গার উপর দিয়ে মাল চলাচলের উপর মাশুল আদায়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে চৌকী বসায় এবং শোভা সিংহের বিদ্রোহীদের মধ্যে কেউ কেউ তানা দুর্গও দখল করে নেয়। এর ফলে স্থানীয় ইংরেজরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং হুগলীর ফৌজদারের অনুরোধে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ইংরেজরা কামান বোঝাই এক রণতরীও প্রেরণ করে। এই বিদ্রোহ যখন পরবর্তীকালে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে, ঠিক সেই সময় শোভা সিংহের হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়, তার ভাই হিম্মৎ সিংহ সেনাধ্যক্ষ হয়ে পুনরায় বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামা শুরু করে। কিন্তু তদানীন্তন বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খান ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের গোড়ার দিকে মুখসুদাবাদের কাছে ভগবানগোলায় এই বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করলে বিদ্রোহীরা আবার মেদিনীপুরে ফিরে যায়। তবে যুদ্ধে পরাজিত হলেও তারা নিশ্চুপ থাকেনি। বিভিন্ন স্থানে লুটতরাজের সঙ্গে নদীতেও চৌকি বসিয়ে রাখে। এর মধ্যে উলুবেড়িয়ার চৌকি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর যুবরাজ আজিম-উশ-শান চন্দ্রকোণা দুর্গ আক্রমণ কালে বিদ্রোহী পাঠান সর্দার রহিম শার মৃত্যু হলে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়।

অতএব ক্ষণস্থায়ী এই বিদ্রোহের অবসানে হাওড়া জেলায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অদূরবর্তী কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি তার উন্নতির সহায়ক হয়ে উঠতে থাকে। খ্রীষ্টীয় আঠার

শতকে দিল্লীর সমকালীন বাদশাহ ফারুকশায়রের কাছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক প্রতিনিধিদল ভাগীরথীর পূর্বতীরে ভোগ দখলী তেত্রিশখানা গ্রামের পুনরায় বন্দোবস্তের এবং সেই সঙ্গে নদীর পশ্চিমতীরে বোরো পরগণার অন্তর্ভুক্ত শালিখা, হাড়িড়া (বর্তমানের হাওড়া), কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর ও বেতড় এই পাঁচটি গ্রাম নতুন বন্দোবস্তের জন্য পাট্টা দেবার প্রার্থনা জানায়। এর ফলে ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী তেত্রিশটি গ্রামের তালুকদারী বন্দোবস্ত দেওয়া হলেও, বাংলার নবাবের আপত্তির ফলে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের ঐ পাঁচটি গ্রামের পত্তনী দেবার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়নি। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শীদকুলি খাঁর আমলে এবং ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের আমলে ভূমিরাজস্ব বিধি সংশোধনের দরুণ সমগ্র উলুবেড়িয়া মহকুমা এবং হাওড়া সদর মহকুমার এক বিরাট অংশ বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্গী আক্রমণের সময় মীর হাবিব বলে কথিত জনৈক ব্যক্তি মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই জেলার ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরবর্তী বেশ কিছু এলাকায় লুটপাট করে এবং সেই সঙ্গে থানা মাকুয়া দুর্গটিও দখল করে নেয়। ফলে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ব্যাপক লুণ্ঠন ও অত্যাচারের মধ্যে শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। অন্যদিকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণকালে এই থানা মাকুয়া দুর্গ আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নবাবী ফৌজকে পরাস্ত করে ইংরেজরা সে সময় এ দুর্গ দখল করে নেয়। কিন্তু নবাবপক্ষের সামরিক চাপ অব্যাহত থাকায় ব্রিটিশরা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এ দুর্গ পরিত্যাগ করে। তারপর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান শাসনের অবসান হ'লে শুরু হয় দু'শো বছরের ইংরেজ শাসন।

৪

জেলার মানুষজন

ক. লোকসংখ্যা ঃ ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুযায়ী হাওড়া জেলার জনসংখ্যা ৩৭,২৯,৬৪৪ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৯,৮২,৪৫৭ এবং মহিলার সংখ্যা ১৭,৪৭,১৮৭ জন। মোট জনসংখ্যার ১৮,৮০,৫৩০ জন গ্রামবাসী এবং অবশিষ্ট ১৮,৪৯,১১৪ জন শহরবাসী। জেলায় তফশিলি জাতির সংখ্যা ৯,৭৮,৩০৩; এর মধ্যে পুরুষ ৫,০৩,৩২৩, নারী ৪,৭৪,৯৮০।

দেখা যাচ্ছে, এই শতকের উনিশের দশকে এ জেলার জনসংখ্যা ১৯০১ সালের তুলনায় শতকরা ৩৫ % বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। যদিও উনিশ শতকের শেষদিকে, অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলায় ম্যালেরিয়া বা বর্ধমান জ্বর এবং কলেরা বসন্ত ও পেটের পীড়া জনিত নানাবিধ মহামারীর প্রকোপে বেশ লোকক্ষয় হয়েছে। ১৮৯৬ সালে হাওড়ার শহর এলাকায় পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ার দরুণ এই মৃত্যুহার কমতির দিকে দেখা যায়। অন্যদিকে এই জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কারণই হল, হাওড়া শহর ও তার আশেপাশে এবং দক্ষিণে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত নদী তীরবর্তী এলাকায় বড়-ছোট বহু কলকারখানা স্থাপনের ফলে ভিন্ন রাজ্য থেকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের আগমন। তাছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক চাষী ও জনজাতি লোকজন বিভিন্ন স্থানে চাষবাস, ইঁটভাঁটা ও রেলপথের নানান কাজে এ জেলায় আসার কারণেও লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। জেলার নানাস্থানে ছোট-বড় জলনিকাশী পরিকল্পনার ফলে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত স্থানগুলি বর্তমানে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হওয়ায় জেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আর এক কারণ। সর্বোপরি ১৯৪৭ সালের পর ভারত বিভাগের কারণে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত বহু বাস্তুহারা পরিবারের এ জেলায় বসবাসের দরুণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

খ. ভাষা ঃ এ জেলার জনসংখ্যার অধিকাংশেরই মাতৃভাষা হ'ল বাংলা। জেলায় সর্বমোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ বাংলা ভাষী। জেলায় কলকারখানা গড়ে ওঠার দরুণ বহিরাগত অন্যান্য ভাষাভাষীদের আগমনে পরবর্তী শতকরা ৮.৮৯ ভাগ হিন্দি এবং শতকরা ৩.৩৯ ভাগ উর্দু ভাষায় কথা বলে থাকেন। অবশিষ্ট ভাষাভাষীদের মধ্যে ওড়িয়া ভাষার লোকসংখ্যা শতকরা ১.২ ভাগ। এ ছাড়া তেলেগু, গুরুমুখী ও নেপালী এবং সাঁওতালী ও ওঁরাও জাতিগোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের সংখ্যাও অল্পবিস্তর। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষাভাষীর লোকসংখ্যাও যেমন রয়েছে, তেমনি বেশ কিছু সংখ্যক পুস্ত, চীনা ও পার্সী ভাষাভাষীদেরও এ জেলায় দেখা যায়।

জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে সাঁওতাল, ওঁরাও ও মুণ্ডারা জেলার অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসার জন্য নিজস্ব ভাষা ছাড়াও বাংলা ও হিন্দিতেও কথাবার্তা বলে থাকেন।

গ. উপভাষা ঃ জেলার পূর্বাংশ শহরাঞ্চল হওয়ায় এবং সেখানে কলকারখানার দৌলতে মিশ্রভাষী মানুষজনের আগমন ঘটায়, ঐসব এলাকার ভাষার চরিত্র নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অন্যদিকে জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে গ্রামীণ জীবনে যে উপভাষার প্রচলন ছিল, তা স্কুল-কলেজি শিক্ষার এবং বেতার ও দূরদর্শনের দৌলতে অপস্রিয়মান। জেলার দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীদের কথ্য ভাষার সঙ্গে পশ্চিম রূপনারায়ণ নদের পরপারে মেদিনীপুর জেলায় গ্রাম্য মানুষজনের ভাষার বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

তাছাড়া এমন কিছু চলিত কথ্য ভাষা আছে যা এক থানা এলাকার সঙ্গে অন্য থানা এলাকার কথ্য ভাষার সঙ্গে মিলতে চায় না। তাছাড়া এক এক এলাকায় একই শব্দের বিভিন্ন মাত্রায় উচ্চারণ বদলই হল এক স্থানিক বৈশিষ্ট্য। মুসলমান বসতিপূর্ণ এলাকায় প্রচলিত কথ্য ভাষার মধ্যে বহুল পরিমাণে আরবী ও ফার্সী ভাষার শব্দ বিকৃভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

এ জেলার উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, দুটি শব্দের একত্র সমাবেশে সেটিকে সংক্ষেপিত করে তৃতীয় একটি শব্দ সৃষ্টির প্রবণতা; উদাহরণস্বরূপ, 'কি জানি' এটি কথ্য ভাষায় হয়ে ওঠে 'কেইনি' বা 'পালিয়ে চল' উচ্চারণে হয় 'পালি চ' এবং পালিয়ে আয় হয়ে দাঁড়ায় 'পালি আয়'। আবার কথ্য ভাষায় অপনিহিতির উদাহরণও আছে, যেমন 'করিস নি' হয়ে দাঁড়ায় 'করিনিস্' বা 'যাস নি' হয়ে যায় 'যাইনিস' ইত্যাদি। বাঁকড়ী কথ্য ভাষার মত 'আনা করিয়ে দেওয়া' যেমন আনানোর অর্থে ব্যবহৃত, হাওড়ার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তেমনি 'ঢোকানো' অর্থে ব্যবহার করা হয় 'ঢুক করিয়ে দেওয়া' বা সেঁধিয়ে দেওয়া উচ্চারণে দাঁড়ায় 'স্যাঁধ করিয়ে দেওয়া' ইত্যাদি। কথ্য ভাষার উচ্চারণে জেলার বহুস্থানে দেখা যায় 'এ' কারের স্থলে বিশেষভাবে 'অ্যা'-এর প্রয়োগ। যথা, হেথা হয় 'হ্যাথা', কাঁকড়ার উচ্চারণ ক্যাঁকড়া বা 'সেথা'র বদলে হয় 'সথা'। 'ও' কারের উচ্চারণে ও টিকে বাদ দেওয়া হয়, যেমন গোটা হয়ে দাঁড়ায় 'গটা'। 'ও'-র বদলে 'অ'-এর উচ্চারণের দৃষ্টান্ত, 'ওকে' হয় 'অকে'। আবার অকার উচ্চারণে 'ও'-এর প্রয়োগ, যথা লজ্জা হয় লোজ্জা বা অন্যায় হয় 'ওন্যায়'। অন্যত্র 'আ' কার পরিবর্তিত হয়ে 'এ' কারে রূপান্তরিত কথার নমুনা, চারের পাঁচ হয় 'চেরের পাঁচ' বা রাতের বেলা হয় 'রেতের বেলা'। এ ছাড়া প্রচলিত উপভাষার মধ্যে বহু দেশীয় শব্দ দেখা যায়, যার অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত, 'বাকুল' (অর্থে প্রাচীর ঘেরা বাড়ি), পাঁজারি (অর্থে ফড়ে), ক্যাঁদাল (অর্থে বাড়ির পিছন দিক), ম্যাঁচলা (অর্থে ডাবা বা গামলা), রাকাড়া (অর্থে কথা বলা) ইত্যাদি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জেলার উপভাষা সম্পর্কিত চর্চা তেমন হয়নি এবং দ্রুত নগরায়নের ফলে অদূর ভবিষ্যতে জেলায় প্রচলিত বহু দেশীয় শব্দের সঙ্গে উপভাষাটিও যে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে তেমন আশঙ্কা করা যেতে পারে।

ঘ. ধর্ম ঃ এ জেলায় প্রধানত হিন্দু ও ইসলাম ধর্মমতই লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ এ জেলায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম ও পারসি জোরাথুষ্ট প্রভৃতি আটটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বসবাস। এর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়কে অবশ্য শহরাঞ্চলেই দেখা যায়।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিষ্ণুর উপাসক হিসাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে প্রাচীনকাল থেকেই অস্তিত্ব ছিল তা প্রমাণিত হয়, এ জেলার নানাস্থানে পাল-সেন যুগের নির্মিত বেশ কিছু পাথরের বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কারে। পরবর্তী চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত হওয়ায় এ জেলার নানাস্থানে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের মঠ, মন্দির ও অস্থল দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতার বলে গণ্য করে তাঁর ভক্তগণ সেইভাবেই তাঁকে পূজার্চনা করে থাকেন। হাওড়া জেলার নানাস্থানের বৈষ্ণব মন্দিরে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের উর্দ্ধবাহুযুক্ত মূর্তিও পূজিত হতে দেখা যায়।

হাওড়ার পাশের জেলা হুগলীর তারকেশ্বরে একদা যেমন দশনামী শৈব সন্ন্যাসীদের এক বৃহৎ আখড়া স্থাপিত হয়েছিল, তেমনি এ জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত গড় ভবানীপুর গ্রামে এ সম্প্রদায়ের একটি শৈব মঠ দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের শেষ দিকে দশনামী সন্ন্যাসী পূরণ গিরির প্রযত্নে এবং পাঞ্চেন লামার অর্থসাহায্যে হাওড়ার মালীপাঁচঘরা থানার এলাকাধীন ভোটবাগানে একটি মঠ এবং তিব্বতী লামাদের অবস্থানের জন্য একটি আশ্রম ও সরাইখানা নির্মিত হয়। সুতরাং এখানকার এই ধর্মীয় স্থানটি তিব্বতী লামাবাদ ও দেশীয় দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে একীকরণের এক আভাস দেয়।

দশনামী শৈবদের মত এ জেলায় নাথযোগীদেরও আস্তানা দেখা যায়। একদা হাওড়া শহরের খুরুট এলাকায় এই সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্র এবং বাউড়িয়াতেও এই সম্প্রদায়ের একটি মঠ ছিল।

এ জেলায় মুসলমান পীর ও গাজীসাহেবদেরও বেশ প্রতিপত্তি দেখা যায়। মুসলমান অভিযানের শুরু থেকে স্বাধীন সুলতানদের আমল পর্যন্ত একসময়ে মুসলমান ফকির, পীর ও গাজীসাহেবরা এদেশের শাসনকার্যে ও সেই সঙ্গে ধর্ম প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাওড়া জেলায় এইসব পীর-পয়গম্বরের যেসব আস্তানা বা দরগা গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ডোমজুড় থানা এলাকার গয়েশপুরে পীর গিয়াসুদ্দিন, আমতা থানায় আমতা বন্দরের নিকটবর্তী পীর সাহেব ও রাউতাড়া গ্রামে মানিকপীর, জগৎবল্লভপুর থানার বামুনপাড়ায় মানিকপীর ও মুন্সিরহাটে ফতে আলী, শাঁকরাইল থানার শাঁকরাইলে বড়পীর ও সারেঙ্গা গ্রামে সারেঙ্গা পীর, উলুবেড়িয়া থানার বাণীবনে জঙ্গলবিলাস পীর এবং বাগনান থানার কল্যাণপুর গ্রামে বুড়ো সাহেব পীর প্রভৃতি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নরনারী এইসব পীরকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, তাঁদের কাছে মানত করেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে মানসিকের শিরনি দিয়ে যান।

এ জেলায় খ্রীস্টান সম্প্রদায় মূলতঃ শহরাঞ্চলেই বসবাস করেন। তবে উলুবেড়িয়া ও বাউড়িয়া থানার এলাকাধীন বেশ কিছু স্থানে এই সম্প্রদায়ের বসবাস দেখা যায়। এছাড়া হাওড়া শহর ও উলুবেড়িয়াতে স্থাপিত পুরাতন ও নূতন বেশ কয়েকটি গির্জা এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম এ জেলার হাওড়া, ব্যাঁটরা, বাগনান, উলুবেড়িয়া, আমতা প্রভৃতি থানা এলাকায় প্রসার লাভ করে। বিগত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সাঁতরাগাছিতে এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণপুরে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমতা থানায় এ ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তক ফকিরদাস রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অমরাগড়ি গ্রামে যে নববিধান ব্রাহ্ম উপাসনালয়টি স্থাপিত হয়, তার সঙ্গে কলকাতার কেশব সেন স্ট্রিটের ব্রাহ্মমন্দিরের সাদৃশ্য আছে।

হাওড়া জেলায় বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির বসবাস রয়েছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বাসস্থানের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ভাগীরথী তীরবর্তী বালী এবং দামোদর তীরবর্তী আমতা থানা এলাকার নারিট ও

উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত ডিহি ভুরশুট গ্রাম প্রভৃতি, যেগুলি একদা বিদ্যাসমাজ হিসাবে বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছাড়া জেলায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসবাস দেখা যায় সাঁতরাগাছি এলাকায়। অন্যদিকে কায়স্থ সমাজের বসবাস মূলতঃ হাওড়ার শিবপুর এলাকায় হলেও জেলার সর্বত্র এই জাতির বসবাস রয়েছে। বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিশেষ কেন্দ্রীভূত বসবাস দেখা যায় জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার বাকুল গ্রামে। এ ছাড়াও নবশাক শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন কুটির শিল্পী ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের বসবাস জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে আছে। তফসিলী জাতি এবং তফসিলী জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের বাস এ জেলাব সর্বত্র দেখা যায়।

৬. লৌকিক দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠান ঃ এই জেলার লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সব লোকউৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে জেলার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এক বিচিত্র উপাদান ও দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উচ্চসমাজ বহির্ভূত জাতিগোষ্ঠীরই অবদানে ভরে উঠেছে জেলার সংস্কৃতি, যার পরিচয় জেলায় লৌকিক বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের আলোচনায় পাওয়া যেতে পারে। এ জেলার লৌকিক দেবতা হিসেবে শিবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হল গাজন উৎসব। চৈত্র মাসে গাজন উপলক্ষে এই জেলার প্রতি শিবমন্দিরে বেজে উঠে ঢাকের বাজনা। তবে জেলার সব শিব মন্দিরেই গাজন হয় না। যেসব শিবঠাকুরের গাজন হয় তারই মন্দির বা থানের সংলগ্ন প্রাঙ্গনে এই সময় তিন কোণা লাল রঙের এক পতাকা তোলা হয় এবং পতাকার দণ্ডটিকে সিঁদুর দিয়ে রাঙ্গিয়ে ঢাকের বাদ্য সহকারে সেটিকে নিয়ে মন্দিরের চার পাশ ঘোরা হয় ; অর্থাৎ সাধারণ্যে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এবার গাজন উঠ্‌লো। এর পরের অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসীভক্তরা উত্তরীয় ধারণ করেন।

গাজন উৎসবে অন্যান্য যেসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার মধ্যে ঝাঁপপড়া, কাঁটা গড়া, হিন্দোল, বাণফোঁড়া, ধুনুচি নৃত্য প্রভৃতি।

চৈত্র মাসে শিবের গাজন ছাড়া হাওড়া জেলায় গাজন হয় বৈশাখ মাসে ধর্মদেবতাকে কেন্দ্র করে, যা ধর্মের গাজন নামে খ্যাত। হাওড়া জেলার পশ্চিমাঞ্চলে একদা চণ্ডী ও বিশালাক্ষ্মীর গাজন হতো বলে জানা গেছে। আলোচ্য ধর্মের গাজনের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও রীতি পদ্ধতি ঠিক শিব গাজনের মতই। তবে এখন এ জেলায় ধর্মের গাজন আর তেমন হয় না। বেশ বোঝা যায়, ধর্মের উপাসনায় ভাঁটা পড়ে যাওয়ায় ধর্মের গাজন এখন শিবের গাজনে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, ধর্মঠাকুরের পরিত্যক্ত কর্ম মূর্তি কোন কোন গ্রাম্য দেবদেবীর থানে রাশিকৃত ভাবে এসে জমা হয়েছে। তবে এ জেলায় একদা যে ধর্মঠাকুরের প্রাধান্য ছিল, তা বোঝা যায়, 'কালু রায়', 'বিনোদ রায়', 'বাঁকুড়া রায়', 'স্বরূপনারায়ণ রায়' 'যাত্রাসিদ্ধি রায়', 'মতিলাল রায়' প্রভৃতি ধর্মঠাকুরের এগারোটি বিভিন্ন স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত মন্দিরের অস্তিত্ব দেখে। এ জেলার নিম্নবর্ণের ডোম বা অন্যান্য সম্প্রদায় এখনও ধর্মপূজার আচার-অনুষ্ঠানকে কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কেন ধর্মঠাকুরের পূজো-পদ্ধতির সমাদর কমে গেল—তার সঠিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

অন্যদিকে চৈত্র মাসে গাজন উৎসব ছাড়া এই জেলায় হয় ঘেঁটু উৎসব। ঘেঁটু ঠাকুর

খোস-পাঁচড়া আর ঘা নিবারণের দেবতা। তাই তাকে পালকিতে চাপিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে নৃত্যগীত সহকারে ভ্রমণ করা হয়। এই উপলক্ষে গাওয়া ঘেঁটু ঠাকুরের গানগুলি এই জেলার লোকসঙ্গীত হিসাবে একান্ত নিজস্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হাওড়া জেলার অন্যান্য সব গ্রাম্য দেবদেবীদের মধ্যে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায়, বিশালাক্ষী, চণ্ডী, ষষ্ঠী ও ওলাবিবি প্রভৃতি প্রতি গ্রামে একই সঙ্গে বিরাজ করেন। এ জেলার দক্ষিণাঞ্চলে এই সব দেবদেবীর মৃন্ময় মূর্তি কিছু কিছু দেখা গেলেও অধিকাংশ স্থানে খোলা গাছতলায় ঘটের ঠাকুর হিসেবে বা কোথাও একখণ্ড পাথরকে ঐ সব দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। গ্রাম্য এই সব দেবদেবীর বাৎসরিক উৎসবে পূজানুষ্ঠান ছাড়াও হয় জাগরণ গান এবং ঐ উপলক্ষে যেসব বিচিত্র অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার মধ্যে আমাদের আদিমতর সমাজের যৌথ জীবনযাত্রার এক পরিচয় পাওয়া যায়। দেবদেবীর এইসব উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় বনভোজন, ধুনো পোড়ান অনুষ্ঠান এবং এই সঙ্গে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎসব 'সই পাতানো' বা 'সয়লা' অনুষ্ঠান। আলোচ্য এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশেষ এক সয়লা গানও হয়ে থাকে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বাংলার সংস্কৃতিতে বন্ধুপাতানো এককালে ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এ জেলার আর এক লোকউৎসব হল মনসা পূজা এবং তাকে কেন্দ্র করে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে হয় অরন্ধন উৎসব। এ জেলায় প্রথম অরন্ধনটি হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরায়; দ্বিতীয় শ্রাবণ সংক্রন্তিতে—যা ঢেলাফেলা উৎসব নামে পরিচিত; তৃতীয় অরন্ধন ভাদ্র মাসে, যা এই জেলায় 'চচ্চড়ি' পুজো নামে খ্যাত এবং সবশেষের অরন্ধন হল রান্না পূজোর অনুষ্ঠান ভাদ্র-সংক্রান্তিতে। লক্ষণীয় যে, সব অরন্ধন অনুষ্ঠানেই সিজ মনসা গাছের ডালে দেবী মনসার পুজো হয়ে থাকে।

এর পর দীপালী উৎসবে বিচিত্র সব ছড়া-মন্ত্রের সঙ্গে মশাল জ্বালানো হয়, যা 'ধোধুল ধরানো' নামে খ্যাত। দীপালী অমাবস্যার পরদিন খুব ভোরে হয় সুখ ভাঁটা এবং পরে হয় গৃহস্থের সম্পদ গরুর 'চাঁদ-বদনী' ও মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে অন্ন-ব্যঞ্জন ভাসিয়ে দেওয়ায় অনুষ্ঠান—যা আদিবাসী সমাজের বাঁধনা পরবেব অনুষ্ঠানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সীমান্ত বাংলার লোকউৎসব 'টসু' পরবের মত কার্তিকের শেষে অঘ্রানের শুরুতে আরম্ভ হয় 'ইতু' পুজোর অনুষ্ঠান, যা স্থানীয়ভাবে 'এঁতেল' ঠাকুরের পূজো বলেই খ্যাত। এখনও এই জেলার পল্লীরমণীবা ঘরে ঘরে বিভিন্ন ছড়া সহযোগে এই ব্রত উৎসব পালন করে থাকেন।

পরিশেষে আছে পৌষ উৎসব। পৌষ উৎসবের দিনটি লক্ষ্মীর বন্দনায় পিঠে-পায়েস ইত্যাদির মধ্যে বঙ্গবালাদের আচার-অনুষ্ঠান সীমিত থাকে এবং পরদিন পুরুষেরা করেন 'আখ্যেন' উৎসব। বাঁকুড়া জেলায় যা 'এখেন' উৎসব, হাওড়া জেলায় তাই হল 'আখ্যেন'। এদিন গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে কৃষিজীবী সমাজের অধিকাংশ পুরুষেরা ধেনো মদ এবং তাড়ি প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য অতিমাত্রায় পান করে থাকেন।

এ ছাড়া এ জেলায় বারব্রত ও আচার-অনুষ্ঠান যে কতশত রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কৃষিজীবীরা ধান রোওয়ার কাজ শেষ হলে নানান ছড়ার মধ্য দিয়ে 'হেলেনী ব্রত' পালন

করেন। ধানের শীষ আসার আগে সেটিকে মাতৃরূপ কল্পনায় গর্ভবতী বলে মনে করে স্বাদ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নলগাছ পুঁতে ছড়া আবৃত্তি করে। এছাড়া কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান হিসাবে কয়েকটি স্থানে দোলযাত্রার সময় খড়-বাঁশের ঘর পুড়িয়ে চাঁচর উৎসব করা হয় এবং সেই ছাই দেবতার প্রসাদ হিসাবে মাঠে ছড়ানো হয়।

হাওড়া জেলায় লৌকিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সার্বিক অনুসন্ধান ও সমীক্ষার কাজ এ যাবত তেমন হয়নি এবং এ কাজ সমাধা হলে আঞ্চলিক সংস্কৃতির বহু মূল্যবান বিবরণ ও উপাদান পাওয়া যেতে পারে, যা সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীদের কাছে একান্তই মূল্যবান বলে সমাদৃত হতে পারে।

চ. কৌম গোষ্ঠী ঃ হাওড়া জেলায় তফসিলী জনজাতির সংখ্যা হল ১৪১৯৫ জন (১৯৯১-এর আদমশুমার অনুযায়ী), যা জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা হার ০.২৫ ভাগ। ১৯৯১-এর আদমশুমার মতে এদের মধ্যে পুরুষ ৭৫০৬ জন ও নারী ৬৬৮৯ জন।

হাওড়া জেলায় ডোমজুড়, শাঁকরাইল, জগাছা ও বালী থানায় মূলতঃ ওঁরাও সম্প্রদায়ের বাস। সাধারণত এই জনজাতি সম্প্রদায় চাষের কাজে বা ইটভাঁটার কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই সম্প্রদায়ের পূজিত প্রধান দেবতা হল 'ধরম'। এ ছাড়াও তারা দেবী মাই, গাঁওদেওতী, কালী, মনসা, শীতলা ও হরি ইত্যাদিরও পূজো করে থাকেন।

জেলার জগৎবল্লভপুর ও জগাছা থানা এলাকায় বসবাসকারী মুণ্ডা সম্প্রদায় হলেন মূলতঃ কৃষিজীবী ও ক্ষেতমজুর। এদেরও ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকাচার হল ওঁরাওদের মত এবং এদের প্রধান দেবতা হল 'সিংবোঙা'। এ সম্প্রদায় মাঘী পরব, সারুল পরব, ফাগুয়া প্রভৃতি উৎসব পালন করা ছাড়াও কালী, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার্চনাও করে করেন।

এ জেলায় বসবাসকারী অন্য আর একটি সম্প্রদায় হলেন সাঁওতাল, যাদের বসবাস দেখা যায় শাঁকরাইল, জগৎবল্লভপুর, বালী ও বাউড়িয়া থানা এলাকায়। উপজীবিকার ভিত্তিতে এ সম্প্রদায়কে অবশ্য তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত এক শ্রেণী আছেন যারা শিক্ষিত সম্প্রদায় হিসেবে শহর বা শহরতলীতে নিযুক্ত কাজকর্মের তাগিদে ভাড়া করা গৃহে বসবাস করেন। অন্য আর এক শ্রেণী হলেন, যারা পাকাপোক্তভাবেই এখানে বসবাস করে স্থানীয়ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন এবং শেযোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সময় সময় চাষবাসের কাজে বা রাস্তা তৈরীর কাজে এবং ঠিকে ধরনের অন্যান্য কাজে এ জেলায় সাময়িকভাবে এসে থাকেন। এদের প্রধান দেবতা হলেন 'ঠাকুর', কিন্তু পার্শ্বদেবতা 'বোঙারা' হলেন ভীষণ অপকারী দেবতা, যারা সব সময়েই ভক্তদের কাছে তুষ্টিসাধনের দাবি করে থাকেন।

৫

জীবনযাত্রার উপকরণ

ক. ঘরবাড়ি ঃ হাওড়া জেলার ঘরবাড়ি প্রসঙ্গে বলতে গেলে বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের কথাই বলতে হয়। কারণ শহরাঞ্চলের বসতবাড়ির অধিকাংশই পাকাবাড়ি এবং স্থানে স্থানে টালি-খোলায় ছাওয়া কিছু বস্তি বাড়ি। গ্রামের বাড়িঘরের অধিকাংশই হল মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনিযুক্ত চারচালা বা আটচালা রীতির। আর্থিক সঙ্গতিপন্নরা একসময়ে ইংরেজ রাজত্বে খড়ের বদলে চালের ছাউনিতে বিলেত থেকে চালান আসা ঢেউ খেলানো টিন ব্যবহার করেছিলেন এবং এখনও বহুক্ষেত্রে ঘরের চাল ছাওয়াতে সেই টিনের ব্যবহার অব্যাহত আছে। এখন খড়ের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ অনেকেই টালির ছাউনির দিকে নজর দিয়েছেন। মাটির দেওয়াল ছাড়া বাঁশ, বাখারি, কঞ্চি ও অন্যান্য কাঠকুঠো দিয়ে তৈরি দেওয়ালযুক্ত যে আবাসগৃহটি তৈরি করা হয়, সেটিকে স্থানীয়ভাবে ছিটেবেড়ার ঘর বলা হয়ে থাকে।

এ জেলার মাটির বাড়ির বৈশিষ্ট্য হল, দু' থেকে তিন ফুট (০.৬ মি. থেকে ০.৯ মি.) চওড়া দেওয়াল দিয়ে নির্মিত একতলা বা দোতলা মাটির বাড়ি। এসব মাটির বাড়িগুলি প্রায় ২ মিটার বা তারও উঁচু পোস্তা বা ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাধারণতঃ এর কামরাগুলি হয় সামনে চওড়া বারান্দাসহ দু'কুঠরি বিশিষ্ট। সাধারণ গৃহস্থেরা তাদের এই বসতবাড়ির চারদিকে দোচালা আচ্ছাদনযুক্ত উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়ে প্রাচীর ঘিরে দেন এবং এই প্রাচীর সংলগ্ন স্থানে সদব ঘর, রান্না ঘর ও ঢেঁকিশাল স্থাপন করেন। এ ছাড়া প্রাচীর ঘেরা স্থানে বা অন্যত্র প্রয়োজনমত গোলাকার বা বর্গাকার আকারের ধানের গোলাও প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু গোয়াল ঘরটি প্রাচীরের বাইরে আলাদা ভাবে অথবা কখনও প্রাচীরের সংলগ্ন নির্মাণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রামাঞ্চলে কোন গৃহ নির্মাণের পূর্বে প্রস্তাবিত গৃহটি যে বাস্তুর উপর স্থাপিত হবে সেটির গুণাগুণ বিচারের জন্য স্থানীয় অগ্রদানী, গ্রহবিপ্র বা আচার্য ব্রাহ্মণদের পরামর্শ নেওয়া হয় এবং পরামর্শদাতারাও আঞ্চলিকভাবে রচিত 'বাস্তুশাস্ত্রের' নির্দেশ অনুসারে ভূমির অবস্থান ও লক্ষণাদি বিচার করে ঘর বসাবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, সে উপদেশের মধ্যে থাকে, বাড়ির গড়ন যাতে পরিপাটি হয়, বাড়িটিতে আলো হাওয়া যাতে ভালভাবে চলাচল করে, লোকের চলাফেরার দরুণ কাজকর্মে বিঘ্ন না ঘটে এবং সর্বোপরি গৃহবাসিদের স্বাচ্ছন্দ্যহানি না হয় ইত্যাদি।

জেলার সম্পন্ন গৃহস্থেরা অবশ্য দোতলা মাটির বাড়ি নির্মাণের দিকেই নজর দিয়ে থাকেন। হাওড়া জেলায় এই ধরনের দোতলা রীতির মাটির বাড়ি নির্মাণের ধারা বহুদিন থেকেই প্রচলিত আছে। এ জেলায় খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের মঙ্গলকাব্যের কবি দ্বিজ হরিদেব রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে এই ধরনের উঁচু মাটির বাড়ির উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথমে $\frac{১}{২}$ মিটার উঁচু করে কাদামাটির দেওয়াল দেওয়া শুরু করা হয় এবং সে দেওয়াল শুকিয়ে গেলে পুনরায় তার উপরে আবার ঐ উচ্চতায় কাদামাটির দেওয়াল দেওয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না প্রার্থিত উচ্চতায় পৌছোয়। দেওয়ালের কাজ শেষ হলে কাঠামো এবং ছাউনির কাজ সম্পন্ন করা হয়। শুধু একতলা বা দোতলা মাটির বাড়ি নির্মাণই নয়, সেগুলিকে সুশ্রী ও

রুচিসম্পন্ন করার জন্য সদ্য সম্পন্ন বাড়ির দেওয়ালে পাতলা পাঁকের সঙ্গে উলু ঘাস সহযোগে মসৃণভাবে প্রলেপ দেওয়া হয়, যাকে বলা হয়, 'উলুটি'র কাজ। এর পরের পর্যায়ে পাতলা পাঁকের সঙ্গে তুষ মিশিয়ে দেওয়ালে লেপন করে 'তুষুটি'র কাজ সম্পন্ন করা হয়। সবশেষে পাঁকের সঙ্গে মিহি সাদা বালি ও পাটের কুঁচি মিশিয়ে তৈরি পলস্তারা ঐ তুষুটি করা দেওয়ালের উপর মসৃণভাবে লেপা হয়, যার নাম 'পেটোটির' কাজ। দুঃখের কথা, বিগত ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বিধ্বংসী বন্যায় এ জেলায় নির্মিত এমন বহু সাবেকী মাটির ঘর বিধ্বস্ত হওয়ায় বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ইটের দেওয়াল অথবা পূর্বকথিত ছিটেবেড়া যুক্ত বাড়ি তৈরির রেওয়াজ বেড়েছে।

আবাসগৃহের পর দেবতাদের মন্দির-দেবালয়ের স্থাপত্য বিষয়ক আলোচনায় এলে দেখা যায়, গ্রাম্য দেবদেবীর অধিকাংশেরই কোন স্থায়ী পাকা মন্দির নেই। তবে যে কটি পাকা মন্দির দেখা যায় সেগুলির স্থাপত্য শৈলী হল খড়ো ঘরের অনুকরণে নির্মিত প্রথাগত চারচালা বা আটচালা রীতির মন্দির। এছাড়া, রত্ন বা চূড়া যুক্ত রীতির পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দির এবং ওড়িশার মন্দির শৈলী প্রভাবিত শিখর মন্দিরও দেখা যায়। জেলার মন্দির-দেবালয় সংক্রান্ত এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, ইটের তৈরি শিব মন্দিরের সংখ্যা ১৩০টি, বিষ্ণু বা রাধাকৃষ্ণের মন্দির ৫৯টি, দুর্গা চণ্ডী কালী চামুণ্ডা প্রভৃতির মন্দির ১৭টি, ধর্মরাজের মন্দির ১১টি, বিশালাক্ষীর ৬টি, শীতলা-মনসার ২টি ও অন্যান্য দেবদেবীর ৯টি মন্দির।

এ জেলার বেশ কিছু দেবদেবীর থান বা মন্দিরের চত্বরে প্রতিষ্ঠিত চারদিক খোলা যে মণ্ডপটি দেখা যায়, তাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় আটচালা মণ্ডপ। যেহেতু উপরে ও নিচে চারটি করে আটটি চাল যুক্ত তাই স্বাভাবিকভাবেই মণ্ডপটি আটচালা নামকরণে ভূষিত হয়েছে। সাধাবণতঃ এই মণ্ডপে শ্রোতাদের সমাবেশে নানান ধর্মসভা, যাত্রা-গান ও নৃত্যাদি উৎসব-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এছাড়া, জেলার কয়েকটি স্থানে বর্ধিষ্ণু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত খিলানযুক্ত বারান্দা সহ পাকা দুর্গা দালান দেখা যায়। পূর্বে এই সব দুর্গামণ্ডপগুলি খড়ে ছাওয়া দোচালা রীতিতেই নির্মিত হত এবং এগুলিকে বলা হত চণ্ডীমণ্ডপ। জেলার দু একটি স্থানে এই ধরনের চণ্ডীমণ্ডপ আজও দেখা যায়! কোন কোন স্থানে আবার চণ্ডীমণ্ডপের সামনের প্রশস্ত অঙ্গনে নির্মিত হ'ত পূর্ববর্ণিত রীতির আটচালা মণ্ডপ।

মুসলমান বসতিপূর্ণ গ্রামে ধর্মীয় উপাসনার জন্য অবশ্য একটি করে মসজিদ থাকে। মাটির দেওয়ালযুক্ত মসজিদ ছাড়াও বহুস্থানের মসজিদই ইটের তৈরি দালান রীতির অথবা মিনার সহ এক থেকে ছ' গম্বুজ বিশিষ্ট সৌধ।

এ জেলায় খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার জন্য নির্মিত গির্জাগুলি প্রধানতঃ শহরগুলিতে অবস্থিত এবং সেগুলির স্থাপত্য বিদেশী প্রভাবাধীন সুউচ্চ মিনার যুক্ত।

খ. ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ঃ জেলার কৃষিজীবী পরিবার তাদের চাষের কাজে আবহমান কাল ধরে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন সেগুলি হল, লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, খুরপি, দাউলি প্রভৃতি। সাধারণতঃ চাষের কাজের এসব যন্ত্রপাতি গ্রামের কর্মকাররাই তৈরি করে থাকেন। অনেক সময় এসব যন্ত্রপাতি স্থানীয় মেলায় বিক্রীর জন্য আসে।

হাওড়া জেলার পশ্চিম পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন বাঁশদা নামক স্থানে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে যে মেলা বসে, সেখানে বিশেষভাবে লাঙ্গল-জোয়াল থেকে মায় কৃষিজীবীদের ব্যবহৃত নানান দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য আমদানী হয় এবং এ জেলার প্রান্তবর্তী কৃষক সমাজ এখান থেকেও কৃষির ঐসব সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করে থাকেন।

কর্মকার সমাজের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বেশ কিছু বর্তমানে কলকাতা থেকে কিনে আনা হয় এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিজেরাই তৈরি করে নেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, এ জেলার কৃষি ও শিল্পজীবী সূত্রধর, মালাকার এবং রাজমিস্ত্রিরা তাদের যন্ত্রপাতির অধিকাংশ নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় কর্মকারদের উপর নির্ভর করে থাকেন। বিশেষ করে জেলার শঙ্খকার সম্প্রদায় এক সময়ে তাদের শাঁখ কাটার করাতটি নির্মাণে এ জেলার বাঁটুল গ্রামের সুদক্ষ কর্মকার কারিগরদের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে শাঁখের করাত নির্মাণে উল্লেখযোগ্য কর্মকার শিল্পীদের বসবাস ছিল কেবলমাত্র এ জেলার উল্লিখিত বাঁটুল গ্রাম ও বর্ধমান জেলার দীননাথপুর গ্রাম। এছাড়া গৃহস্থালীর দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্যাদিরও স্থানীয় কর্মকারদের দ্বারা নির্মিত হয়।

স্থানীয় কুম্ভকার সম্প্রদায় যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন সেগুলির অধিকাংশই নিজেরা তৈরি করে নেন এবং তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চাক। এই সঙ্গে বাঁশ থেকে নির্মিত চেঁচারি, বইলা ও কাঠের পিটনৈ ইত্যাদি যন্ত্রপাতিও তাদের মৃৎশিল্পের কাজে লাগে।

তাঁতের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তাঁতশিল্পীরা কলকাতা বা হাওড়া হাট এবং পাশাপাশি মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন রাধামনির বিখ্যাত সুতিদ্রব্যের হাট থেকে সংগ্রহ করেন।

গ. বেশবাস ঃ গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ পুরুষেরা ধুতি ও মেয়েরা শাড়ি পরে থাকেন। এক সময়ে পুরুষেরা ধুতি, পাঞ্জাবী বা সার্ট পরিধান করতেন, কিন্তু বর্তমানে রুচি পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক পুরুষই প্যান্ট, হাওয়াই সার্ট এবং পাজামা পরিধান করে থাকেন। অন্তর্বাস হিসাবে একসময় যে ফতুয়ার চলন ছিল তা প্রায় অন্তর্হিত হয়ে পরিবর্তে এসেছে গেঞ্জি। তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল সার্টের বদলে রঙীন এক ধরণের গেঞ্জি ব্যবহারের চলন বেড়েছে এবং উল্লেখ করা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুতির পোষাকের বদলে কৃত্রিম তন্তুজাতীয় কাপড়ের পোষাক ব্যবহারের দিকেই আগ্রহ যেন বেশি।

এ জেলার মুসলমান পরিবারের লোকজনের অধিকাংশেরই পোষাক ধুতি ছাড়া লুঙ্গি ও পাজামা এবং বর্তমানে প্যান্ট-শার্ট প্রভৃতি পরিধানের দিকেই আগ্রহ বেড়েছে।

জুতো হিসাবে উভয় সম্প্রদায়ই চটি ব্যবহার করেন এবং বর্তমানে অর্থনৈতিক কারণে চামড়ার বদলে এসেছে রবার ও রবার ফোম থেকে তৈরি চটি। নিম্ন ও উচ্চবিত্তেরা পোষাক অনুযায়ী মোজা সহ বুট ও নিউকাট ধরনের জুতো ব্যবহার করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেয়েরা শাড়ি ব্যবহার করেন এবং সেই সঙ্গে পরিধান করেন সায়া, ব্লাউজ ও অন্তর্বাস হিসাবে কাঁচুলি বডিস। বর্তমানে সুতি কাপড়ের বদলে

কৃত্রিম তন্তু জাতীয় শাড়ি ব্যবহারের দিকেই বেশি নজর। কি শহর বা গ্রামাঞ্চল, সর্বত্রই মেয়েদের মধ্যে বর্তমানে সালোয়ার-কামিজ পরিধানের দিকে আগ্রহ যথেষ্ট বেড়েছে।

স্থানীয়ভাবে তাঁতের কাপড়, মশারি ও গামছা প্রভৃতি এ জেলার আমতা, উদয়নারায়ণপুর ও জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার গ্রামাঞ্চলে তৈরি হয় এবং সেগুলি বিক্রির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাওড়ার হাটে রপ্তানি করা হয়। অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তু জাতীয় কাপড় ও পোষাকের সম্ভার কলকাতার বড়বাজারের আড়ত থেকে আমদানী করা হয়।

ঘ. খাদ্য ঃ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী হাওড়া জেলার জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের অধিক ব্যক্তি অকৃষি পেশায় নিযুক্ত। অন্যদিকে পৌর শহরাঞ্চলের বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন কলকারখানা ও রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজনে বহুল পরিমাণে কৃষি জমি অধিকৃত হওয়ার জন্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশই কমতে শুরু করেছে। এর ফলে জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাষের জমি না থাকায় খাদ্য উৎপাদনে জেলাকে ঠিক স্বনির্ভর বলা চলে না। তবুও এ জেলায় ভাগীরথী, দামোদর ও রূপনারায়ণের তীরবর্তী পলিমাটি দিয়ে গঠিত ভূভাগ ধান চাষের পক্ষে একান্তই উপযোগী। সাম্প্রতিককালে পতিত জমি আবাদযোগ্য করে তোলার জন্য সরকারীভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ জেলায় উৎপাদিত প্রধান ফসল হল ধান। ধানের পরেই উল্লেখযোগ্য খাদ্যশস্য হল ছোলা, খেসারি, মুগ ও মুসুরি জাতীয় ডাল-কড়াই। এছড়া জেলার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তৃতভাবে নারকেলের চাষ হয়ে থাকে। জেলার সদর মহকুমায় গ্রামাঞ্চলে কাঁঠাল ও আমের বাগান দেখা যায় এবং লিলুয়া ও ডোমজুড় থানায় আনারসের চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া জেলায় ব্যাপকভাবে কাঁচকলা ও বিচিকলা চাষ ছাড়াও কাঁঠালি, মর্তমান, সিঙ্গাপুরি, চাঁপা কলাও উৎপন্ন হয়। গ্রামাঞ্চলের নানাস্থানে খেঁজুর, পাতি ও কাগজি লেবু, তেঁতুল, জাম, জামরুল, পেয়ারা প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। জেলার দামোদর নদীতীরবর্তী স্থানে আখ, আলু, পটল, বেগুন, ঝিঙ্গে, কপি, মুলো চাষ ছাড়াও শসা ও ফুটিও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। জেলার নানাস্থানের ডাঙ্গা জমিতে বরবটি, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, সিম, পটল, ঢেঁড়স প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। জেলায় এক সময়ে উৎপাদিত সাঁতরাগাছির ওল বেশ বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সাঁতরাগাছি এলাকায় না হলেও আশপাশের গ্রামে উৎপন্ন এই ওল জেলার শহরাঞ্চল ছাড়া কলকাতাতেও চালান আসে।

ঙ. উৎসব অনুষ্ঠান ঃ হাওড়া জেলার বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-পার্বণকে কেন্দ্র করে যে মেলা বসে তার মধ্যে প্রধান হল শিবগাজনকে কেন্দ্র করে চড়কের মেলা। আমতা, বাগনান, ডোমজুড়, পাঁচলা, শাঁকরাইল, শ্যামপুর ও উলুবেড়িয়া থানা এলাকার বহু গ্রামেই চড়ক উপলক্ষে একদিনের জন্য মেলা বসে থাকে। বিশেষ করে বাগনান থানার বাইনান গ্রামে শিবগাজনের সন্ন্যাসীদের বাণ ফোঁড়া এবং শ্যামপুর থানার রতনপুর গ্রামে ঝাঁপপড়া অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত ও দর্শকের আজও সমাগম হয়ে থাকে। পূর্বে অনেক গ্রামের শিবমন্দিরে এই উপলক্ষে হাকন্দ, হিন্দোল ও কাঁটাগড়গড়ানি অনুষ্ঠান, হ'ত। এছাড়া শিবগাজনকে কেন্দ্র করে আজও বহু গ্রামে আবহমানকাল ধরে অনুষ্ঠিত কালকেপাতারি ও ধুনুচি নৃত্য

প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে কালপ্রভাবে এসব অনুষ্ঠান বর্তমানে লোপ পেতে বসেছে।

শিবের গাজনের মত বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির সময় এ জেলায় বহু গ্রামে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হত এবং সে উপলক্ষে মেলাও বসতো। এখনও ধর্মের গাজন দু'এক স্থানে হয়ে থাকে। তবে কালক্রমে ধর্মের গাজন বর্তমানে লুপ্ত হওয়ার পথে।

জেলায় গাজন উৎসবের পর বহু গ্রামে মেলা বসে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসবের সময়। এছাড়া জেলার দু'একটি গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতেও রথের মেলা বসতো। বর্তমানে বহু গ্রামের রথ বিনষ্ট হওয়ায় রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় না বটে, তবে সেই উপলক্ষে মেলা বসে থাকে।

কালীপূজা উপলক্ষে জেলার নানাস্থানে মেলা বসে থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মেলা হল বাগনান থানার এলাকাধীন খালোড় গ্রামে দক্ষিণা কালীর মেলা। ভাদ্র মাসে ঐ দেবীর কাছে পাকা তাল এবং পৌষ মাসে মূলো নিবেদন করার রীতি প্রচলিত থাকায় আমাবস্যা যোগে ঐ সময় যথাক্রমে তালকালী ও মূলোকালীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমতার খড়িয়পে কালীপূজা উপলক্ষে সাতদিন ব্যাপী মেলা বসে থাকে। এছাড়া শিবরাত্রি, রামনবমী, দোল, রাস, গঙ্গাপূজা, ভীমপূজা উপলক্ষে যেমন জেলার নানাস্থানে মেলা বসে থাকে, তেমনি লৌকিক দেবদেবী চণ্ডী, শীতলা. মনসা, পঞ্চানন ও বিশালাক্ষীকে কেন্দ্র করেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার নিজবালিয়া গ্রামের সিংহবাহিনী দেবীকে কেন্দ্র করে পনেরদিন ব্যাপী মেলা বসে থাকে।

হাওড়া শহরে রামরাজা, সাতঘড়ায় নবনারী কুঞ্জর ও ইছাপুরে সৌম্য চণ্ডীর একত্রে প্রতিমা বিসর্জনের দিন রামরাজাতলা স্টেশন থেকে রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্যন্ত পথের দুপাশে মেলা বসে থাকে।

এ জেলার মুসলিম পীরফকিরদের কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যোগদানে যে সব মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার মধ্যে পৌষ সংক্রান্তিতে শ্যামপুর থানার দেওয়ানতলায় দেওয়ান সাহেব, বাণীবন গ্রামে জঙ্গলবিলাস, আমতায় পীর সাহেব, ডোমজুড়ে গয়েসউদ্দিন পীর, মুন্সিরহাটে ফতে আলী, মানিকপুরে মানিকপীর, সদানন্দবাটীতে সফরীদ সাহেব পীর ও উদয়নারায়ণপুরে ভাইখাঁপীর প্রভৃতি মেলা উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ঘর-গৃহস্থালির জিনিসপত্র সহজলভ্য হওয়ায় এবং শহরে জীবনযাত্রার উপকরণগুলির উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে একদা গ্রামীণ অর্থনীতিতে মেলাগুলির যে অবদান ছিল তার গুরুত্ব ক্রমশই কমতে শুরু করেছে।

৬

কৃষি

ক. জমির প্রকারভেদ ঃ হাওড়া জেলার কৃষিজীবীরা জমির সমতা, গঠন এবং ফলনের নানান দিক অনুযায়ী বিভিন্ন ভূমির শ্রেণীবিভাগ করে তার নামকরণও করেছেন। জমির সমতা অনুযায়ী, যে জমিতে অধিক পরিমাণে জল জমে থাকে তাকে বলা হয়েছে জলা জমি এবং ধান চাষের উপযোগী জল জমিকে বলা হয় শালি জমি। এই শালি জমির তল থেকে সামান্য উঁচু জমিকে সাধারণভাবে এ জেলায় বলা হয়েছে সুনা জমি এবং এর থেকে আরও উঁচু জমির নামকরণ হয়েছে ডাঙ্গা জমি। ডাঙ্গা জমি থেকে আরও উঁচু জায়গাকে ব্যবহার করা হয় বাস্তু জমি হিসাবে এবং ঐ বাস্তু জমির সংলগ্ন ভূমিকে বলা হয় উদ্বাস্তু জমি।

জমির শ্রেণীবিভাগের পর মাটির শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বালিযুক্ত মাটিকে স্বাভাবিকভাবে বলা হয়েছে বেলে মাটি, শক্ত মাটি হল এঁতেল মাটি, কাদাযুক্ত মাটিকে বলা হয় পেঁকো মাটি এবং জলময় নিম্নভূমির মাটিকে ধসা মাটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে জমির ফলন অনুযায়ী শালি ও সুনা জমিকে বলা হয় 'আওল' জমি, যা নাবি প্রথম শ্রেণীর চাষযোগ্য জমি। তারপরেই হল 'দোয়াম' জমি, যাকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী 'সোয়াম' জমি হল তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এবং চতুর্থ শ্রেণী বিভাগটির নামকরণ করা হয়েছে 'চাহারাম' জমি। তবে এই শ্রেণীবিভাগ থেকে বেশ বোঝা যায়, মুসলমান শাসনে জমির উর্বরতা অনুযায়ী খাজনা ধার্যের ক্ষেত্রে জমির যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল সেই নামগুলিই অদ্যাবধি চলে আসছে।

এ বাদেও নদী তীরবর্তী স্থানে, বিশেষ করে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদ থেকে উত্থিত চরভূমিতে পলিমাটি সঞ্চয়ের ফলে জমির উর্বরতাবৃদ্ধির কারণে এই সব স্থানে ধান, পাট, আলু, পটল, কপি, বেগুন, মূলো প্রভৃতি ফসলের সঙ্গে রবিশস্যের চাষও ভালভাবে হয়ে থাকে। চর জমিতে উত্তম ফলনের পক্ষে সুবিধা হল, কাছাকাছি সেচের জলের ব্যবস্থা থাকা।

খ. সেচের ব্যবস্থা ঃ হাওড়া জেলায় প্রবাহিত রূপনারায়ণ, দামোদর ও ভাগীরথী প্রভৃতি নদনদীগুলি সেচের জল সরবরাহে মুখ্য উৎস হিসাবে কাজ করে এসেছে। এই সব নদনদীর সঙ্গে জলকপাট যুক্ত সংযোগরক্ষাকারী বিভিন্ন ছোটবড় খালের মাধ্যমে সেচের জল পাওয়া যায়। আবার জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি নিম্নভূমি হওয়ায় এ জেলায় বেশ কিছু জল নিকাশী খালেরও প্রবর্তন করা হয়েছে। অন্যদিকে আবার শুখো মরশুমে এই সব জল নিকাশী খালগুলি দিয়ে সেচের জল এনে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হয়।

নদীর জল থেকে সেচ ছাড়াও জেলার ছোটবড় দিঘি ও পুষ্করিণী থেকেও প্রয়োজনীয় সেচের জল পাওয়া যায়। আবহমানকাল থেকে প্রচলিত আদিমতম সেচ পদ্ধতি এখনও এ জেলায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। পানের বরোজ চাষীরা পান চাষের জন্য সেচ দেন একটি বৃহদাকার মাটির কলসী দ্বারা, যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'বারাঙ'। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাঁশের চাঁচ দিয়ে বুনুনি করা বা টিনের পাত দিয়ে তৈরি ত্রিকোণাকার সিউনির দুপ্রান্তে দুটি করে দড়ি বেঁধে দু'জন ব্যক্তি সহজেই জল সেচন করে থাকেন। এছাড়া জলসেচের আরও যেসব প্রণালী আছে সেগুলি হল, জলাশয়ের ধারে স্থাপিত চারটি বাঁশ

দ্বারা যুক্ত ফ্রেমের উপরিভাগে লম্বালম্বিভাবে একটি বাঁশ রাখা হয় যার একদিকে থাকে প্রয়োজনমত ভারী কোন বস্তু দিয়ে আটকানো ভরনা এবং অন্য প্রান্তটিতে প্রয়োজনমত দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকে তাল গাছের দ্বিখণ্ডিত গুঁড়ি দিতে তৈরি ডোঙ্গা। এবার বাঁশের দণ্ডে ঝুলতে থাকা ঐ ডোঙ্গার একপ্রান্ত জলাশয়ের জলে ডুবিয়ে পরিমাণমত জল তুলে নালায় চালান করে দেওয়া হয়। বর্তমানে অবশ্য তালের ডোঙ্গার পরিবর্তে এসেছে টিনের পাত দিয়ে তৈরি বাঁকানো ডোঙ্গা। আবার কোন পুষ্করিণীর জল নিচু তলদেশে থাকায়, সেক্ষেত্রে সেচের জল, ঐ জলাশয়ের ধারে বাঁশ দিয়ে চৌকো আকারে একটি মঞ্চ করা হয় এবং পুকুরের পাড়ে চারটি বাঁশকে একত্রিত করে তার উপরিভাগে পূর্বকথিত ঐ প্রথার মত লম্বালম্বিভাবে একটি বাঁশ রাখা হয়। ঐ বাঁশের এক প্রান্তে প্রয়োজনমত ভরনা এবং অন্যপ্রান্তে থাকে ঝোলানো একটি সরু লাঠি যাতে লাগানো হয় বালতি অথবা ঝোলানো কোন চৌকো টিন। এবার ঐ মঞ্চের উপর রাখা হয় একটি তালের ডোঙ্গা যা উপরিভাগে জলনালীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ঐ সরু লাঠিতে বাঁধা বালতিটিকে কুয়োর জল তোলার মত নিচে নামিয়ে জলপূর্ণ করে উপরে তুলে এনে ঐ ডোঙ্গায় সেই জল ঢেলে দেওয়া হয়, যাতে সহজেই জলনালায় ঐ জল গড়িয়ে যেতে পারে।

তবে, পুরানো প্রথায় সেচের পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন দেখা যায় এ জেলায়। বর্তমানে উন্নত ফলনশীল ধান চাষে সেচের তাগিদে এ জেলার খালনালার সংস্কার করা হয়েছে। তাছাড়া দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন কর্তৃক খনিত খালের জল দিয়ে আমতা, জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুড় থানার বেশ কিছু এলাকায় সেচের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে; প্রয়োজনে ডিজেল বা কেরোসিন চালিত ছোট বড় পাম্পিং মেসিন বসিয়ে। নদী তীরবর্তী স্থানে রবিফসলের সেচের জন্য বহুস্থানে নদীবক্ষে নৌকোর উপর পাম্প মেসিন বসিয়ে উপরের দিকের জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বিগত ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে নদীর জল দিয়ে সেচব্যবস্থার জন্য আমতা ও উদয়নারায়ণপুর থানার বহু স্থানে সরকারী ব্যয়ে স্থায়ীভাবে বেশ বড় আকারের পাম্প মেসিন বসানো হয়েছে। এছাড়া নদীর জলে যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই, সেখানে সরকারী উদ্যোগে গভীর জলের নলকূপ বসিয়ে ক্ষেতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যত্র বহু স্থানে কৃষকেরা অগভীর নলকূপ বসিয়ে ডিজেল চালিত বা বিদ্যুতচালিত পাম্প মেসিন দিয়ে প্রয়োজনমত সেচের কাজ সমাধা করে থাকেন। এক্ষেত্রে হাওড়া জেলার কৃষিতে সেচভুক্ত জমির পরিমাণ হিসাব করলে দেখা যায়, জেলায় প্রায় চার লক্ষ একর পরিমাণ জমির মধ্যে, চাষযোগ্য জমি প্রায় তিন লক্ষ একর এবং এর মধ্যে জলসেচের আওতায় এসেছে মাত্র সত্তর হাজার একর পরিমাণ ভূমি।

গ. প্রধান ফসল ঃ এ জেলার প্রধান উৎপন্ন ফসল হল ধান। এছাড়া জেলায় উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের মধ্যে, পাট, পান, আখ এবং তৈলবীজ হিসাবে তিল, সরষে, মুসনে প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। ধানের মধ্যে এ জেলায় ঋতুকালীন আউস, আমন ও বোরো ধানের চাষ হয়ে থাকে। তবে পূর্বে নিচু জমিতে আমনের পর বসন্তকালীন বোরো ধানের চাষ হয়ে থাকতো। বর্তমানে কিন্তু বোরো ধান চাষের বদলে উঁচু বা নিচু যেমনই জমি হোক না কেন, সেচের সুবিধাযুক্ত স্থানে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে।

এ জেলার দামোদরের চরে শরৎকালীন ফসল হিসাবে সাধারণত আউস ধানের চাষ

হয়ে থাকে। এ ধানের মধ্যে ফেবড়ি আশী দিনের মধ্যে পরিপক্ক হয় এবং বেগড়ি বালাম, কুমীরগোড়, মালগোড় ও আকুন্দি নামের আউস ধানেরও এ জেলায় চাষাবাদ হয়।

আউসের পর শীতকালীন আমন ধান। এ জেলায় জমির গুণগত তারতম্য অনুযায়ী চাষাবাদ হয় এমন বিভিন্ন প্রকার আমন ধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পাটনাই, রূপশাল, সীতাশাল, ঝিঙ্গেশাল, বালাম, শশী বালাম, চামরমনি, কাচুয়া, ভাসামানিক, কলমকাটি, রঘুশাল, দুধকলমা, ভাসাকলমা, লাঠিশাল প্রভৃতি। খই ও মুড়ির জন্যে বিশেষভাবে চাষ হয়ে থাকে হামাই, ঝিঙ্গেশাল, চামরমনি ও কনকচুর প্রভৃতি।

এ জেলায় জল জমে থাকা নিচু জমি অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে যাকে বলা হয় ডহর জমিতে উৎপাদিত হয়ে থাকে পাঁকশাল, বারুই, মেখি, আঁধারমনি, কোটেবুড়ো, আগুনলী, লালকলমা, অর্জুনশাল, কুবেরহানা প্রভৃতি ধান। একেবারে জলে ডুবে থাকা বাদা জমিতে জলের চাপ সহ্য করা মোটা জাতীয় যে ধানের চাষ হয়ে থাকে তার নাম ওড়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, জেলার বহুস্থানে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর ধান চাষের বদলে আমনের সময়েও চাষীরা এখন নানা জাতীয় উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের দিকেই বেশি নজর দিয়েছেন। এছাড়া দেখা যাচ্ছে, এ জেলায় আমন ধানের গড়পড়তা ফলন যেখানে ভাল জমিতে এককাহন খড় সহ বিঘা প্রতি সাত থেকে আট মণ এবং নিরেস জমিতে ঐ একই পরিমাণ খড়সহ পাঁচ থেকে সাত মণ, সেখানে উচ্চ ফলনশীল ধানের উৎপাদন হয় গড়পড়তা বিঘা প্রতি পনের থেকে ষোল মণ। এ জেলায় উঁচু ফলনশীল ধানের মধ্যে চাষীরা জয়া, রত্না, আই আর ৩৬, শঙ্কর, ললাট, মিনিকিট, ১২৮০, ইরি প্রভৃতি নামের ধানগুলিকেই বেশি পছন্দ করে থাকেন।

ধানের পর এ জেলার আর একটি অর্থকরী ফসল হল পান। এক সময় বাগনান থানার বাঁটুল গ্রামে উৎপাদিত পান ভারতের বিভিন্ন স্থানে একান্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার জন্যে এখান থেকে পান নানাস্থানে চালান যেত। বিশেষ করে এই এলাকার পানচাষীদের নৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতায় উৎপাদিত এই অপূর্ব স্বাদের বাঁটুল পানের সমকক্ষ পশ্চিমবাংলার আর কোথাও ছিল না। বর্তমানে বাগনান, আমতা ও উলুবেড়িয়া থানার গ্রামাঞ্চল ছাড়াও জেলার অন্যত্রও এই পান উৎপাদিত হয়ে থাকে। জেলার নানাস্থানে স্থাপিত পানের আড়তে এই পান চাষীরা বিক্রির জন্যে আনেন এবং সেগুলি ফড়ে ও আড়তদারেরা কিনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চালান দেয়। এ জেলায় আর একটি উল্লেখযোগ্য চাষাবাদ হল ফুলের চাষ। বিশেষ করে বাগনান থানার পশ্চিমপ্রান্তের বিভিন্ন গ্রামে নানাবিধ মরশুমী ফুলের চাষ করা হয় এবং ফুলগুলি বিক্রির জন্য পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ও দেউলির দৈনিক বাজারে অথবা সরাসরি কলকাতার বড়বাজারে বিক্রির জন্য চালান আসে।

ফুলের চাষ ছাড়া এই এলাকায় বিভিন্ন ফল ও ফুলের কলমকাটা চারা তৈরি করেন এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কৃষকরা এবং সেগুলি কলকাতার হাতীবাগান বাজার ছাড়া চাহিদামত অন্যত্রও চালান দেওয়া হয়।

কৃষি প্রসঙ্গে হাওড়া জেলায় মৎস্য চাষ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ জেলায় পুকুর, ডোবা ও ঝিল প্রভৃতিতে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্য ছাড়াও, রূপনারায়ণ

ও ভাগীরথী নদী থেকে মৎস্যজীবীরা নানাবিধ মাছ ধরে স্থানীয় হাটে-বাজারে চালান দেন। এখানকার রূপনারায়ণ নদের তপসে মাছ যেমন বিখ্যাত তেমনি রূপনারায়ণ ও ভাগীরথী থেকে ধরা ইলিস মাছেরও বেশ চাহিদা দেখা যায়। এছাড়া বর্ষা সমাগমে এ জেলার বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে মাছের ডিম পোনার চাষে বহু ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন। লালগোলা, মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থানের নদী থেকে সংগ্রহ করা ডিম পোনা এনে এখানকার পুকুরে সেগুলি ছাড়া হয়। তারপর সেগুলি সামান্য বড় হলে বিশেষভাবে মেদিনীপুর ও ওড়িশা থেকে আগত ব্যাপারীরা তা ক্রয় করে নানাস্থানে চালান দেয়।

ঘ. চাষের সরঞ্জাম ঃ এ জেলায় ধান আবাদের জন্য সাবেকী বলদ টানা হাল-লাঙ্গলই ব্যবহার করা হয়। তবে কিছু কিছু স্থানে সম্পন্ন চাষীরা লোহার তৈরি বিশেষ এক ধরনের লাঙ্গল ব্যবহার করতেন। কিন্তু বর্তমানে জমি চষার কাজে জাপান থেকে আমদানীকৃত চাকাযুক্ত ডিজেল চালিত 'পাওয়ার টিলার' ব্যবহারের দিকেই প্রবণতা বেড়েছে। এখন প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই এই ধরনের পাওয়ার টিলার দেখা যায়। নিজস্ব অর্থে অথবা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থে ক্রীত এই যন্ত্রটির মালিকেরা ভাড়া হিসাবে প্রতি ঘণ্টায় নির্দিষ্ট মূল্য ধার্যতায় চাষীর জমি চাষ করে দেন। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে বর্ধমান ও হুগলী জেলা থেকে হলকর্ষণের জন্য বেশ কিছু ট্র্যাক্টরও এ জেলায় ঘন্টা হিসাবে ভাড়া খাটানোর জন্য আনা হয়। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের জন্য বহু ক্ষেত্রে আধুনিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। সে সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সেচের জন্য ডিজেল বা কেরোসিন চালিত পাম্প মেসিন, সারি দিয়ে বীজ বসানোর যন্ত্র, চাকাযুক্ত নিড়ানী, পোকামাকড়ের উপদ্রব নিবারণের জন্য ডাস্টার ও পায়ে চালানো বা বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এসব যন্ত্রপাতির অধিকাংশ গরীব প্রান্তিক চাষী বা ভাগচাষীরা প্রয়োজনমত বিত্তবান চাষীদের কাছ থেকে ভাড়ায় সংগ্রহ করে থাকেন।

ঙ. ভূমি বিন্যাস ঃ পূর্বে জমিদারী প্রথার অধীন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী সরকারকে দেয় নির্দিষ্ট খাজনার ভিত্তিতে জমি বিলি-বন্দোবস্ত করা হত মধ্যস্বত্বাধিকারী জমিদারদের, যারা চাষযোগ্য জমির অধিকারী রায়ত স্থিতিবান প্রজাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র খাজনা আদায়ের অধিকারী ছিলেন। জমিতে তাদের কোন স্বত্ব ছিল না। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে এইসব রায়ত স্থিতিবান প্রজারা জমির স্বত্ব ভোগ করতেন এবং এই স্বত্বভোগীদের মধ্যে সাধারণত গ্রামাঞ্চলে যাদের অধিক পরিমাণ জমি থাকতো তাদের জোতদার বলা হ'ত। এ ছাড়াও এ জেলায় আরও তিন ধরনের প্রজাস্বত্ব চালু ছিল। এর মধ্যে একটি হল পত্তনী, যা পাট্টাদার ও তার উত্তরাধিকাররা চিরকালের জন্য জমিদারকে নির্ধারিত খাজনা আদায় দেবার ভিত্তিতে প্রজাস্বত্ব ভোগ করতেন। তবে খাজনা আদায়ে খেলাপ হলে বিলি করা ঐ প্রজাস্বত্ব অন্যত্র বিক্রী করে দেবার অধিকারী হতেন জমিদাররা। দ্বিতীয়টি হল, মোকররী মৌরসী, যেটিতে নির্দিষ্ট সামান্য খাজনার বিনিময়ে চিরকালের জন্য জমিতে দখলীস্বত্বের অধিকার কায়েম থাকতো। আর শেষেরটি হল ইজারা প্রথা, যা সোজাসুজি হয় সরকার, না হয় মধ্যস্বত্বাধিকারী জমিদারদের কাছ থেকে যথাযথ নির্ধারিত রাজস্ব বা খাজনা আদায় দেওয়ার বিনিময়ে জমি ভোগদখলের অধিকারস্বরূপ প্রজাস্বত্ব। এ ছাড়াও এ জেলায় দেখা যায়, একসময়ে মোকররী রায়ত বা দখলী রায়তরা তাদের জমি 'কুতখামার'

প্রথায় বিলি করে দিতেন। এ প্রথাটি হ'ল, প্রতি বৎসর মাঠে ফসলের উৎপাদন দেখে সেইমত খাজনা নির্ধারণপূর্বক তা চাষীর কাছ থেকে আদায় করা।

পূর্বে এ জেলায় সাঁজা প্রথায় চাষাবাদকারী আরও এক শ্রেণীর চাষীর অস্তিত্ব ছিল। সাঁজা প্রথায় ছিল হাজা বা শুখা যাই হোক না কেন, বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণের ফসল বা সমমূল্য চাষীকে আদায় দিতে হ'ত জমির মালিককে। পরবর্তী সময়ে এই সাঁজা প্রথা উচ্ছেদ করে সাঁজা চাষীদের জমিতে রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব দেওয়া হয়।

বাংলার অন্যান্য স্থানের মত, এ জেলাতেও জমিদার প্রদত্ত চাকরান জমিরও বিলি-বন্দোবস্ত ছিল। বিশেষ করে গ্রাম্য দেবদেবীর সেবাপূজোয় অংশ গ্রহণের জন্য বিলি করা এই চাকরান জমির স্বত্বভোগীরা খাজনা প্রদানের বদলে সেই গ্রামীণ দেবতার বিভিন্ন সেবাপূজায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন; অর্থাৎ বন্দোবস্ত অনুযায়ী ব্রাহ্মণ যাজনক্রিয়া ও পূজার্চনা করবেন, রজক দেবতার পূজায় অংশগ্রহণকারী ভক্তদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করবেন, নরসুন্দর করবেন ক্ষৌরকর্মাদি, বাদ্যবাজনার জন্য ঢাকী বা ঢোল বাদকরা নিযুক্ত থাকবেন এবং দেবতার পূজায় প্রয়োজনীয় মৃৎ-পাত্রাদি সরবরাহ করবেন কুম্ভকার সম্প্রদায়। এছড়া, জমিদারদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত কর্মচারিরাও চাকরান জমি ভোগ করে থাকতেন।

চাকরান ছাড়াও ছিল লাখেরাজ জমির প্রজাস্বত্ব। সাধারণত বিলিবন্দোবস্ত করা এ জমিগুলি হ'ত নিস্কর এবং এর আওতায় ছিল দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহাত্রাণ ও বৈষ্ণবোত্তর প্রভৃতি বিভিন্ন স্বত্বভোগীর নামকরণযুক্ত ভূমি। অনুরূপ মুসলমান সমাজের ধর্মীয় উপাসনার জন্য বিলি বন্দোবস্ত ছিল পিরোত্তর, ওয়াকফ, চিরাগী ও নসরা প্রভৃতি ধর্মীয় স্বত্বভোগী ভূমি।

বর্তমানে জমিদারীপ্রথা বিলোপ আইনের পর জমির মধ্যাস্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদ করে সরাসরি সরকারের অধীনে রায়ত স্থিতিবান প্রজাদের আনা হয়েছে। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী রায়ত স্থিতিবান প্রজাদের পারিবারিক নির্দিষ্ট জোতের পরিমাণ ৫২ বিঘা পর্যন্ত রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে জোতদারের গোপন করা নির্দিষ্ট সীমার অধিক পরিমাণ জোতজমি সরকারের ভূমি-সংস্কার অধিকার বিভাগ সেগুলি উদ্ধার করে এবং নিজস্ব খাসে এনে দরিদ্র ভূমিহীন চাষীদের বিলিবন্দোবস্ত করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এ জেলায় মূলতঃ জমির চাষী হলেন দু'শ্রেণীর, রায়ত স্থিতিবান স্বত্বভোগী নিজ চাষী এবং ভাগচাষী। নিজ চাষীদের মধ্যেও আবার শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। বর্তমানে এক শ্রেণীর জমির মালিক হাল-লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলার ভাড়া করে এবং নির্দিষ্ট মজুরীর ভিত্তিতে জন-মুনিষ অর্থাৎ ক্ষেতমজুর লাগিয়ে জমি চাষাবাদ করেন। অন্য শ্রেণীর চাষীরা নিজের হাল বলদ এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজনের সহযোগে জমি চাষাবাদ করে থাকেন।

এছাড়া যারা চাষাবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান না, এমন জমির মালিকেরা ভাগচাষীদের কাছে জমি বিলি করে দেন, জমিতে উৎপন্ন অর্ধেক ফসল ভাগ দেবার চুক্তিতে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে ভাগচাষের অর্ধেক ফসলের পরিবর্তে

উৎপন্ন ফসলের দুভাগ চাষীর এবং একভাগ মালিকের প্রাপ্য এই তেভাগার দাবিতে বাংলায় নানা স্থানে ব্যাপকভাবে ভাগচাষী আন্দোলন হয়। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রণীত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন অনুযায়ী উৎপন্ন ফসলের মধ্যে চাষীর ও মালিকের একভাগ এবং বাকী একভাগ যিনি বীজ সার ও সেচের ব্যয় বহন করেন তার প্রাপ্য হিসাবে নির্ধারিত হয়। পরবর্তী উক্ত বর্গাদার আইনের বদলে ভাগচাষ সংক্রান্ত বিষয়টি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের অন্তর্ভুক্ত করে ফসলের ভাগ ৬০ ও ৪০ হিসাবে নির্ধারিত এবং ভাগচাষীকে উত্তরাধিকার সূত্রে চাষাবাদের অধিকার প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বে-আইনী ভাগচাষী উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য সরকারীভাবে ভূমির স্বত্বনির্ধারণ জরিপে ভাগচাষীদের নাম নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গে এটি 'বর্গা অপারেশন' নামে অভিহিত।

এই প্রসঙ্গে জেলার কৃষিতে ক্ষেতমজুরের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনায় এলে দেখা যায়, এ জেলায় কৃষিকার্যে নিযুক্ত ক্ষেতমজুরের সংখ্যা (১৯৯১) ১,৫৭,২৫৩ জন—এর মধ্যে পুরুষ ১৫২১৫৯ ও নারী ৫০৯৪ জন। দুঃখের কথা, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি থেকেও তারা বঞ্চিত। চাষের মরশুম ছাড়া বছরের অধিকাংশ সময় এদের কোন কাজ থাকে না। উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫৯ সালে সরকারের পক্ষ থেকে আইনানুযায়ী হাওড়া জেলার ক্ষেতমজুরদের জন্য যে মজুরি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তার হার ছিল বিড়ি ও জলখাবার সরবরাহের সঙ্গে বয়স্কদের ১.৮৭ পঃ, মহিলা শ্রমিকদের ১.৭৫ পয়সা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ১.১২ পয়সা। বর্তমানে সরকার নির্ধারিত মজুরী ৬২.১০ পয়সা।

চ. কৃষিঋণ ঃ কৃষির মরশুমে চাষের জন্য ঋণ বাবদ গ্রাম্য মহাজনেরা বেশ চড়া সুদেই ঋণ দিয়ে থাকেন। অবশ্য সে ঋণ জমি বা গহনা বন্ধক রাখার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। ভূমিহীন ভাগচাষীরা অবশ্য মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ পান না এবং তাদের নির্ভর করতে হয় যাদের জমি ভাগে চাষ করেন সেই মালিকদের উপর। ধান ভাগের সময় মালিকরা তাদের দেয় ঋণ বাবদ চাষীর অংশ থেকে পরিমাণমত ফসল কেটে নেন। এছাড়া যারা নিজে চাষ করেন তারা আসল কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের অভাব অনটনের সময় আগাম কিছু ঋণ দেন এই শর্তে যে, চাষের মরশুমের প্রথমেই তাদের জমিতে হাল-লাঙ্গল দেবে বা ক্ষেতের কাজ সম্পন্ন করে দেবে। এইভাবে ঋণদাতারা বর্ষার সমাগমে তাদের নিজ চাষ ভালভাবে সম্পন্ন করে ফেলেন বটে, কিন্তু আসল চাষীরা সময়মত চাষ করতে না পারার জন্য বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হন।

মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারী উদ্যোগে স্থানীয় অঞ্চল উন্নয়ন অধিকারের মারফৎ যথাযোগ্য কৃষি, বলদ ক্রয়, চাষের সরঞ্জাম এবং সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া চাষের সময় কৃষিঋণ প্রভৃতি পাওয়ার বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলায় বহুস্থানে গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে ভাগচাষী সমেত সকল চাষীরা সমবায় কৃষি ব্যাঙ্ক থেকে নির্দিষ্ট সুদের ভিত্তিতে প্রয়োজনমত ঋণ সংগ্রহ করে থাকেন। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাছ

থেকেও চাষযোগ্য জমি জামিন রেখে কৃষিঋণ পাওয়া যায়।

ছ. সমবায় আন্দোলন : এ জেলায় কৃষিতে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ দেখা যায় তার সবটাই প্রায় কৃষি সম্পর্কিত ঋণ ও অনুদান নির্ভর। তাহলেও সমবায় আন্দোলনে শামিল হয়ে বিভিন্ন ছোট বড় সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি গ্রাম্য মহাজনদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে কৃষকদের স্বনির্ভর করে তোলার দিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উলুবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কই ছিল এ জেলার একমাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। পরে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অধিকতর পরিষেবা দানের প্রয়োজনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে এটির পরিবর্তিত নামকরণ হয় হাওড়া জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ১৯৬৬-৬৭ সালে এ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় দেখা যায় ৩২টি কৃষি সেবা সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া সেবা সমবায় সমিতিগুলির কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য এ জেলার পাঁচটি বৃহদায়তন সমবায় বাণিজ্যিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, এ জেলার কৃষিজীবী জনসংখ্যার শতকরা প্রায় এগার থেকে বার ভাগ এই সমবায় উদ্যোগের ফলে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যাতে কৃষি উন্নতিতে এই সমবায় আন্দোলন আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে যথাবিহিত উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

৭

শিল্প ও অন্যান্য উপজীবিকা

হাওড়া জেলার শিল্পকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এর একটি হল জেলার কুটির শিল্প এবং অন্যটি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহদায়তন শিল্প। বর্তমানে বহুস্থান দ্রুত শহরাঞ্চলে পরিণত হওয়ার কারণে জেলার কুটিরশিল্পগুলি ক্রমশঃ নষ্ট হতে চলেছে। অন্যদিকে জেলার গ্রাম এলাকার নানাস্থানে বহু কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং হতে চলেছে। ইতিমধ্যে বহু কুটিরশিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জেলার শিল্প প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে বিলুপ্ত ঐসব শিল্পগুলি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

ক. জেলার বিলুপ্ত শিল্প

বর্তমানে লুপ্ত হয়ে যাওয়া সেসব শিল্পের মধ্যে প্রধান একটি ছিল রেশম শিল্প। খ্রীষ্টীয় আঠার-উনিশ শতকে জেলার এ শিল্পটির তখন বেশ রমরমা অবস্থা। জগৎবল্লভপুর, শাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া, বাগনান, আমতা ও শ্যামপুর প্রভৃতি থানা এলাকায় রেশমের গুটিপোকা লালন করা হত এবং সে গুটিপোকাগুলির খাদ্য হিসাবে এ জেলায় ব্যাপকভাবে তুঁত পাতার চাষ করা হত। গুটিপোকার লালায় তৈরি রেশমের যে গুটি তৈরি হত তা থেকে রেশমের সুতো পাওয়া যেত এবং সঙ্গে রেশম বস্ত্রাদির বয়নকাজও সম্পন্ন করা হত। অন্যদিকে প্রস্তুত এই রেশমের গুটিগুলি হুগলী জেলার ফুরফুরা ও মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে চালান দেওয়া হত।

পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসকদের শিল্পনীতির ফলে অন্যান্য জেলার মত এই জেলার রেশমশিল্পও বিনষ্ট হয়ে যায়। রেশম ছাড়া, শতাধিক বৎসর পূর্বে এ জেলার নানাস্থানে 'এণ্ডি'সুতোর চাষ এবং তা থেকে সুতো উৎপাদন করা হত। কিন্তু সস্তা মিলের সুতোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ শিল্পটি বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি।

রেশমের মত এ জেলায় সুতীবস্ত্র উৎপাদনের জন্য তাঁতশিল্পও একদা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। একদা সপ্তগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী সরস্বতী নদীর প্রবাহপথ হুগলী-ভাগীরথীর সঙ্গে সে সময়ে সংযোগসাধিত হয়েছিল বেতড়ে। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের শেষদিকে ঐ বেতড়ে বস্ত্রশিল্পের যে এক বিরাট হাট বসতো তা সিজার ফ্রেডারিকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই শিল্পটিতে নিয়োজিত জেলার বিভিন্ন স্থানের কারিগর ও শিল্পীদের দাদন দিয়ে বস্ত্র উৎপাদনে উৎসাহিত করে। এই সময় জেলায় সুতীবস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, আমতা, উদয়নারায়ণপুর, উলুবেড়িয়া, শাঁকরাইল ও বাগনান প্রভৃতি থানা এলাকার গ্রামাঞ্চল। একসময়, উৎকৃষ্ট সুতিবস্ত্র উৎপাদিত হ'ত জগৎবল্লভপুর থানার নবাসন এবং ডোমজুড় থানার বিভিন্ন গ্রামে। কিন্তু ইংরেজ শাসনে ল্যাঙ্কাশায়ারের কলের তৈরি কাপড়-চোপড় প্রচুর পরিমাণে আমদানী হওয়ায় এ জেলার তাঁত শিল্পে নেমে আসে গভীর অন্ধকার এবং ধীরে ধীরে হাওড়ার বস্ত্রশিল্পের গৌরব অন্তর্হিত হতে থাকে।

বর্তমানে আমতা ও উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বস্ত্রশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠায়, হাওড়ার মঙ্গলা হাটে সেখানকার উৎপাদিত বস্ত্রসম্ভার বিক্রয়ের জন্য চালান আসে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর জেলায় বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক

বেশ কিছু সমবায় সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত বেশ কয়েকটি 'পাওয়ার লুম'ও এ জেলায় স্থাপিত হয়েছে।

হাওড়া জেলার আর একটি শিল্প ছিল পাট ও শন থেকে হাতে বোনা চটশিল্প। এ জেলায় হুগলী-ভাগীরথী তীরে চটকল স্থাপনের পূর্বে বিভিন্ন গ্রামে শনের দড়ি থেকে হাতে বুনে থলে প্রস্তুত করতেন এলাকার কপালী সম্প্রদায়। তাদের তৈরী এই থলে যেমন সাধারণ মানুষের কাছে বস্তার প্রয়োজন সেটাতো, তেমনি বলদের পিঠে ছালা দেবার জন্য এই থলে ব্যবহৃত হ'ত। চটকল স্থাপন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সস্তায় চটের বস্তা সহজলভ্য হওয়ার দরুণ হাত তৈরি বস্তার চাহিদা কমে যাওয়ায় এই শিল্পটি লুপ্ত হয়ে যায়।

একসময়ে আমতা থানার মইনান ও বাগনান থানার মতিনালা গ্রামের মুসলমান কাগজি সম্প্রদায় দেশীয় প্রথায় হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদন করতেন। পরবর্তী সময়ে মেসিনে তৈরি কাগজের সঙ্গে এই শিল্পটি প্রতিদ্বন্দিতায় টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু তাহলেও মইনান গ্রামে এখনও কিছু কিছু হাতে তৈরি কাগজ প্রস্তুত করা হয়।

ঠিক এমনই এক শিল্প ছিল কলিচুন শিল্প, যা এ জেলায় বেশ প্রসার লাভ করেছিল। তখন এদেশে পাথুরে চুনের প্রচলন ছিল না। জলজ বা সামুদ্রিক শামুক ইত্যাদি পুড়িয়ে যে চুন তৈরি করতো এ জেলার চুনারী সম্প্রদায়, তা দিয়ে পাকাবাড়ির গাঁথনি ও পলস্তারা ছাড়াও দেওয়ালে কলি ফেরানো হত। হাওড়া জেলার বাগনান থানা এলাকার খাজুটি, কল্যাণপুর, পিপুল্যান, বাঁটুল, কুলতেপাড়া ও আমতা থানার থলে, রসপুর এবং উলুবেড়িয়া থানার গঙ্গারামপুর প্রভৃতি গ্রামে চুন তৈরিব কারিগর চুনারি সম্প্রদায়ের বসবাসহেতু আমাদের সেই পুরাতন দেশীয় প্রথায় চুন শিল্পটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই জেলার বাগনান ও শ্যামপুর থানা এলাকায় রূপনারায়ণ ও দামোদর তীরবর্তী স্থানে যে একদা দেশীয় প্রথায় লবণ শিল্প গড়ে উঠেছিল তা আজ বিস্তৃতির পর্যায়ে। মোগল আমলে এ শিল্পটির পত্তন হলেও, পরবর্তী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুর জেলার তমলুক সল্ট এজেন্টের অধীনে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত শ্যামপুর, কোটরা ও ডিহিমগুলঘাট এবং বাগনান থানার অন্তর্গত ঘোড়াঘাটা ও গদী তরফের অধীন মানকুর, মলং ঘোড়াঘাটা, নবাসন, পাতিনান ও জালপাই প্রভৃতি গ্রামে লবণ তৈরির কেন্দ্র ছিল। দেশীয় প্রথায় কার্তিক থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এইসব এলাকায় লোনা জল ফুটিয়ে লবণ তৈরি করা হ'ত এবং প্রস্তুত লবণ ছোট ছোট লম্বাকৃতি মাটির পাত্রে রেখে সেগুলি অন্যত্র চালান করে দেওয়া হ'ত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিলেতের লিভারপুল থেকে লবণ চালান আসায় উনিশ শতকেব মাঝামাঝি সময়ে এই দেশীয় লবণ শিল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া বিলুপ্ত শিল্পের মধ্যে আর একটি হল পিতল-কাঁসার থালাবাটি তৈরি শিল্প, যা একদা কেন্দ্রীভূত ছিল বাগনান থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামে।

খ. জেলার বর্তমান কুটির ও হস্তশিল্প :

এ জেলাটি দ্রুত শহরাঞ্চলে পরিণত হওয়ার জন্য জেলার বহু কুটির শিল্প ধ্বংস হতে চলেছে। কিন্তু তা হলেও, এ জেলার কুম্ভকার সম্প্রদায় তাদের প্রথাগত শিল্পটিকে এখনো বজায় রেখে চলেছেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে বসতকারি কুম্ভকার সম্প্রদায় মাটির

হাঁড়ি-কলসি প্রভৃতি নির্মাণ করে থাকেন। উৎকৃষ্ট হাঁড়ি-কলসি এবং বিভিন্ন ধরনের গামলা ও ফুলের টব প্রভৃতি যে সব স্থানে তৈরি হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, জগৎবল্লভপুর থানার পাতিহাল, বাগনান থানার মাদারী ও আন্টিলা, আমতা থানার থলিয়া, শ্যামপুর থানার বাগাগুা প্রভৃতি স্থান। ঘর ছাইবার টালী তৈরির প্রধান কেন্দ্র হল শাঁকরাইল থানার অন্তর্গত সারেঙ্গা, বাগনান থানার অন্তর্গত নলপুকুর এবং ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ঝাঁপড়দহ, আমতা, বালী এবং উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান। বিরাটাকার জলের জালা প্রস্তুতের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হল উল্লিখিত সারেঙ্গা গ্রাম।

বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার মুসলমান রমণীরা তাদের অবসর সময়ে কাপড়ের উপর চিকনের কাজ করে থাকতেন এবং সেগুলি হাওড়া হাট ও নিউমার্কেটে বিক্রীর জন্য চালান যেত। পরে এই চিকনের কাজের জন্য ডোমজুড় থানা এলাকায় জার্মানীর তৈরি এমব্রয়ডারী মেসিন বসানো হয়েছিল। বর্তমানে ঠিক চিকন না হলেও এ জেলার ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, উলুবেড়িয়া, শাঁকরাইল প্রভৃতি থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে সিল্ক বা সুতী কাপড়ের উপর এক ধরনের এমব্রয়ডারী কাজ করা হয়, যাকে স্থানীয় ভাবে বলা হয় 'সাচ্চার কাজ'।

এ জেলার বিভিন্ন স্থানের জলাজঙ্গলে শোলা জন্মানোর দরুণ, শোলা দিয়ে নানাবিধ দ্রব্য তৈরি করে থাকেন জেলার মালাকার সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের তৈরি দ্রব্যগুলি হল, শোলার টোপর চাঁদমালা, রাস উৎসবে ব্যবহৃত শোলার নানাবিধ ফুল-লতাপাতা এবং প্রতিমার সাজসজ্জা প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে একসময় শোলাটুপির বেশ চল ছিল, কিন্তু বর্তমানে তার আর চাহিদা নেই। যদিও এ শিল্পটির অবস্থা বর্তমানে ক্ষীণ, তাহলে এ জেলার বাগনান, আমতা, শ্যামপুর ও ডোমজুড় থানা এলাকায় বেশ কয়েকঘর মালাকার সম্প্রদায় এ শিল্পটিকে এখনও টিকিয়ে রেখেছেন।

হাওড়া শহর ও তার আশপাশে বেশ কিছু ডোম পরিবার রয়েছেন, যারা বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাকসো, চেয়ার, টেবিল ও শিশুদের জন্য দোলনা প্রভৃতি তৈরি করে থাকেন। শহর বা শহরতলী ছাড়া ডোমজুড়, পাতিহাল, জগৎবল্লভপুর, নারনা, মাকড়দহ ও বেগড়ি প্রভৃতি স্থানের রুইদাস ও ডোম সম্প্রদায় বেত দিয়ে যেমন ধামা, পাই ও কুনকে তৈরি করেন, তেমনি বাঁশ দিয়ে কুলো, ঝোড়া, চুপড়ি, চাঙ্গারি ও ধুচুনি প্রভৃতি তৈরি করে থাকেন, যা স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রীর জন্য আনীত হয়।

হাওড়া জেলায় আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হল, মাদুর শিল্প। একদা খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে উলুবেড়িয়া থানা এলাকার ললিতাগড়ি, কানসোনা প্রভৃতি স্থানে মাদুর কাঠির চাষ হওয়ায় সে সব স্থানে বাইতি সম্প্রদায়ের পরিচালনায় মাদুর শিল্পটি গড়ে ওঠে। বর্তমানে সেখানে মাদুর কাঠির চাষ না হলেও, এখনও কিছু কিছু মাদুর উৎপন্ন হয়। তবে উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকার ভবানীপুর, মনসুকা, ও কানুপাট এলাকায় মাদুর কাঠির চাষের জন্য সেখানকার কানুপাট, গড় ভবানীপুর, জঙ্গলপাড়া, কালিকাপুর, মনসুকা, কুমারচক, সিংটি ও সোনপুর গ্রামে শত শত পরিবার এই মাদুর শিল্পটির উপর নির্ভরশীল।

উলুবেড়িয়া থানা এলাকার নানাস্থানে হোগলা উৎপন্ন হওয়ায় এখানে হোগলার পাতা

দিয়ে তৈরি 'ছই' প্রভৃতি প্রস্তুতের এক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে উলুবেড়িয়ার নোনা ও নিমদিঘি প্রভৃতি এলাকায়।

এ জেলার বাউড়িয়া, পাঁচলা, সাঁকরাইল ও উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে নারিকেল গাছের আধিক্যের কারণে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি পান-বিড়ি ধরানোর জন্য ছোবড়ার বোলান নামক দড়ি, পাপোষ প্রভৃতি তৈরীর সরকারী ও বেসরকারী কেন্দ্র ঐসব স্থানে গড়ে উঠেছে। তবে এই শিল্পটির জন্য কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে পাওয়া গেলেও বর্তমানে দক্ষিণ ভারত থেকে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কাঁচামাল আমদানী করতে হয়।

আলোচ্য ছোবড়া শিল্পের পাশাপাশি এ জেলায় একসময়ে নারকোল খোল থেকে হুঁকো তৈরির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল ডোমজুড় থানার ডোমজুড় ছাড়া বেগড়ী, বানিয়াড়া, কোলড়া, ঝাঁপড়দা ও শাঁখরিদহ প্রভৃতি স্থানে। এখানের তৈরি হুঁকো প্রথমে চালান আসতো বেগড়ীর বাজারে, তারপর সেখান থেকে অন্যত্র চালান যেত।

লোহা ও পিতলের তালাচাবি, বাকসের ও আলমারীর জন্য ব্যবহৃত গা-চাবি প্রভৃতি নির্মাণের এক বড় কেন্দ্রস্থল হল জগৎবল্লভপুর থানার মানসিংপুর, বড়গাছিয়া, পাতিহাল এবং ডোমজুড় থানার ডোমজুড় ও পাঁচলা থানার জুজারসা প্রভৃতি গ্রাম। বিগত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের শিল্প দপ্তর বড়গাছিয়াতে একটি কেন্দ্রীয় তালাচাবি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে শুধুমাত্র তালাচাবিই নয়, তালার অন্যান্য খুঁটিনাটি যন্ত্রাংশ স্থানীয় গ্রাম্য কারিগরদের এই কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়।

পাঁচলা থানার দেউলপুরে পোলোবল নির্মাণের কুটির শিল্পটি বেশ অভিনব বলা চলে। বাঁশের গোঁড়াকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে গোলাকার করে এই বলটি তৈরি করা হয়। তারপর এই গোলাকার বলটি কলকাতায় চালান হয়ে আসার পর তার উপর পালিশ ইত্যাদি করে সম্পূর্ণ করা হয়। স্বাধীনতার পর নানান কারণে এই পোলোবলের চাহিদা কমে গেলেও এখনো এখানে এই শিল্পটি কোনক্রমে টিকে আছে।

অনুরূপ উলুবেড়িয়া থানার বাণীবন ও তার পার্শ্বস্থ এলাকায় ফুটবলের এবং ব্যাডমিন্টন খেলার 'সাটলকক্' প্রভৃতি নির্মাণের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

এ জেলায় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত পরচুলা তৈরির কেন্দ্রস্থল হ'ল পাঁচলা থানার অন্তর্গত পাঁচলা, চড়া পাঁচলা, কুলাই এবং বিকি হাকোলা প্রভৃতি স্থান। প্রায় শতাধিক সারাক্ষণের ও আংশিক সময়ের কর্মী এই শিল্পটিতে নিযুক্ত। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিমার পাট দিয়ে চুল তৈরির কাজে এ জেলার বড়গাছিয়া ও পাঁচলার মুসলমান কারিগররা নিযুক্ত আছেন। বলতে গেলে এ কাজটি তাদের একচেটিয়া। বর্তমানে একাজে পাট বা শনের চুলের বদলে চকচকে নাইলনের তন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ জেলায় শাঁখা শিল্পের এক বড় কেন্দ্র হল বাগনান থানার বাঁটুল গ্রাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই শাঁখা শিল্পকে কেন্দ্র করে বাঁটুল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কর্মকার সমাজ শিল্পীদের হাতিয়ার শাঁখের করাত নির্মাণে বেশ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল। শাঁখের করাত নির্মাণে সেজন্য পশ্চিমবাংলার যে দুটি স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তাদের মধ্যে একটি হল উল্লিখিত এই বাঁটুল গ্রাম এবং অন্যটি হল বর্ধমান জেলার দীননাথপুর গ্রাম।

গ. হাওড়ার বৃহদায়তন শিল্প ঃ

জাহাজ নির্মাণ ও সারাইয়ের ডক ঃ কলিকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোড নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে হুগলী-ভাগীরথী তীরবর্তী ঘুসুড়ি থেকে হাওড়া পর্যন্ত এলাকায় অনেকগুলি ডক ও দড়ি তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বেকন সর্বপ্রথম শালকিয়াতে একটি ডক ও জাহাজ সারাই কেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তী ১৭৮১ থেকে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত জেলার নামজাদা জাহাজ নির্মাণ ও সারাই কারখানাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, বাউড়িয়ায় অবস্থিত ফোর্ট গ্লস্টার এবং শালকিয়ার গোলাবাড়িতে জেমস ম্যাকেঞ্জি কোম্পানি। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গোলাবাড়ির ঘাট থেকে দক্ষিণ হাওড়া ঘাট পর্যন্ত এলাকার মধ্যে গোলাবাড়ির নুন গোলার স্থান ছাড়া আরও যেসব ডক ইয়ার্ড নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে ব্রাইটম্যান, ড্রিগনন এবং ম্যাকেঞ্জির ডক ইয়ার্ডের নাম করা যায়। এছাড়া, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হাওড়ায় সাত-আটটি ডক নির্মাণের কথা জানা যায়। এর মধ্যে জনৈক রিভসের ডকটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এখানে নির্মিত স্টিমার বিলেতে চলাচল করেছিল। এই সময়ের প্রসিদ্ধ কাঁসা-পিতলের কারবারী তারকনাথ প্রামাণিক এবং জনৈক কে. সরকারের তৈরি ডকটিও ছিল শালকিয়াতে অবস্থিত। অন্যদিকে কলকাতার পটলডাঙ্গার রাধানাথ বসু মল্লিক ও মিঃ সামুয়েল রিড সাহেবের যৌথ মালিকানায় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে শালকিয়াতে স্থাপন করা হয় 'হুগলী ডকিং কোম্পানি' এবং রাধানাথ বসু মল্লিকের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র জয়গোপাল এই ডকটির কার্য পরিচালনা করেন। এছাড়া, জনৈক পি. মুখার্জি ইউরোপীয় অংশীদারের সঙ্গে যৌথভাবে নির্মাণ করেন আলবিয়ন ডক। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডুর সমবেত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ডক'।

বিগত ১৯৬৫ সালে এক সমীক্ষায় জানা যায়, হুগলী-ভাগীরথী তীরবর্তী হাওড়ার উত্তরে বালি থেকে দক্ষিণে নাজিরগঞ্জ পর্যন্ত চোদ্দটি জাহাজ তৈরি ও সারাইয়ের কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং এইসব কারখানাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল, নাজিরগঞ্জের 'পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস', শালকিয়ার 'হুগলী ডকিং অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি' ও শিবপুরের 'শালিমার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড' প্রভৃতি।

পাকানো কাছি ও দড়িদড়া শিল্প ঃ

হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে পাট ও শন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হওয়ার কারণে এ জেলায় কাছি ও দড়ি শিল্প গড়ে উঠে। জাহাজ নির্মাণ ও সারাইয়ের কারখানার মত জাহাজ বাঁধার কাছি তৈরির উদ্দেশ্যে নির্মিত এ শিল্পটিও বেশ প্রাচীন। মার্ক উডের ১৭৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে দেখা যায়, ঘুসুড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি কাছি নির্মাণ কারখানা। আপজন সাহেবের কৃত ১৭৯২-৯৩ সালের এক মানচিত্রেও হাওড়া সেতুর কাছে একটি দড়ি কারখানার উল্লেখ দেখা যায়। এছাড়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেও ঘুসুড়িতে এই ধরনের কাছি তৈরির এক কারখানা স্থাপনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এইসব কাছি ও দড়ি তৈরির কারখানার অবস্থানের জন্য অনুমান করা যায়, জাহাজে শক্ত কাছির প্রয়োজনে এই শিল্পটি হাওড়ায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে হাওড়ার দক্ষিণ প্রান্ত শিবপুর পর্যন্তও এই কাছি

কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে শালিমারে স্থাপিত আমুটি অ্যাণ্ড কোম্পানির কাছি তৈরি কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে ১৮২৫ সালের মধ্যে এইসব কাছি ও দড়ি তৈরি কারখানাগুলির অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেছে এবং বহুক্ষেত্রে এইসব কাছি তৈরি কারখানাগুলির স্থানে স্থাপিত হয়েছে জাহাজ তৈরি ও সারাইয়ের কারখানা। বর্তমানে হাওড়ায় যে কাছি তৈরীর কারখানাগুলি আছে তার মধ্যে উল্লেখ্য হল, শিবপুরে 'গ্যাঞ্জেস রোপ ওয়ার্কস' ও 'শালিমার রোপ ওয়ার্কস' এবং ঘুসুড়িতে 'ডাবলিউ এইচ হারটন কোম্পানি'।

সুতো বয়ন শিল্প ঃ

বিগত ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শালকিয়াতে মোড়কের প্রয়োজনে এক সুতো পাকানোর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। পরবর্তী ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাউড়িয়াতে ভারতের সর্বপ্রথম সুতোকল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এ জেলায় বেশ কয়েকটি সুতোকল স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলায় যেখানে পাঁচটি সুতো কল ছিল, পরবর্তী ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই কলের সংখ্যা দাঁড়ায় তেরটি। ১৯৬৫-৬৬ সালে জেলার সুতোকলের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট উনচল্লিশটি। বর্তমানে জেলার উল্লেখযোগ্য বৃহৎ সুতোকলগুলি হল, বাউড়িয়া কটন মিল, সেন্ট্রাল কটন মিল, হাওড়া কটন মিল। পাশাপাশি মাঝারি ধরনের সুতোকলগুলি হল, ফুলেশ্বরের হনুমান কটন মিল, শ্যামপুর থানা এলাকায় অনন্তপুর টেকস্‌টাইল, হাওড়া শহরের ভিক্টোরিয়া কটন মিল প্রভৃতি।

চটকল ঃ

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার ঘুসুড়ি এলাকাতেই সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পরবর্তী ১৮৭৩ সালে ফোর্ট গ্লস্টারে এবং উনিশ শতকের শেষ দিকে শিবপুরে 'শিবপুর জুট মিল' (পুরাতন) এবং রামকৃষ্ণপুরে 'হাওড়া জুট মিল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ঐ সময়ে এ জেলায় চটকলের সংখ্যা কুড়িটি। এর মধ্যে রাজগঞ্জের ন্যাশনাল কোম্পানি লিঃ, চেঙ্গাইলের লাড্‌লো জুট কোম্পানি লিঃ, বাউড়িয়া ফোর্ট গ্লস্টার ইন্‌ডাসট্রিজ (নিউ মিল), শিবপুরে হাওড়া জুট মিল, মানিকপুরের ডেলটা জুট মিল, হাওড়ার যোগেন্দ্র মুখার্জি রোডের শ্রীহনুমান জুট মিল, বানীপুরের ন্যাশনাল কোম্পানি লিঃ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও হাওড়ার শিবপুর, বালি, বেলুড়, চেঙ্গাইল ও নলপুরেও বেশ কয়েকটি চটকল আছে।

তেলকল ঃ

১৮৩০ সালে জেসপ অ্যাণ্ড কোম্পানী ভাগীরথী তীরবর্তী স্থানে যে সরষের তেল মাড়াইয়ের কলটি স্থাপন করে, পরবর্তীকালে সে স্থানটির নামকরণ হয় তেলকলঘাট। এই সময়কালেই ঘুসুড়ি ও শালকিয়ার নদী তীরবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয় রেড়ীর তেল মাড়াইয়ের কল। ১৮৭২ সালে সাঁতরাগাছিতেও একটি তেল কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিংশ শতকের সুরুতে রামকৃষ্ণপুর ও শালকিয়াতে চালু করা হয় বেশ কয়েকটি তেলকল। বর্তমানে হাওড়া জেলার শালিমার, হরগঞ্জ, বামনগাছি, কদমতলা, ও খুরুট প্রভৃতি স্থানে প্রায় এগারোটি তেলকল প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।

করাত কল ঃ

হাওড়ায় জাহাজ নির্মাণ কারখানার দৌলতে উনিশ শতকের প্রথম দিকে সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত করাত কল প্রতিষ্ঠিত হয় নদীতীরবর্তী বাতাইতলায়। ১৮৭২ সালে শিবপুরে ও ১৮৬১ সালের পূর্বে ঘুসুড়ি এলাকাতে করাত কল স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৯০৮ সালে করাত কল প্রতিষ্ঠিত হয় শালকিয়া ও শিবপুরে। ১৯৬৫ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, এমন সতেরটি করাত কলের অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে তার অনেকগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে।

ধাতুশিল্পের কারখানা ঃ

হাওড়ায় সর্বপ্রাচীন লোহা কারখানার সন্ধান পাওয়া যায় ১৮১১ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত শিবপুরের আলবিয়ন মিলস, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুরু জোনস্। ১৮৯৬ সালে তেলকল ঘাট এলাকায় বার্ণ অ্যাণ্ড কোম্পানী তাদের লোহা কারখানা স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে এই তেলকলঘাট এলাকাতেও আরও কিছু লোহা কারখানা গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় মালিকানাধীন এইসব লোহাশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ১৮৫৭ সালে এদেশীয় ঈশ্বরচন্দ্র মাজী লোহা ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করেন হাওড়া ঘাটে, যা পরে খুরুট এলাকায় উঠে যায়। পরবর্তী সময়ে শিবপুর ঘুসুড়ি, রামকৃষ্ণপুর ও শালকিয়াতেও বেশ কয়েকটি লোহা কারখানা এবং সেইসঙ্গে লোহা ঢালাই ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী সময়ে লোহা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এ জেলায় অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। বেশ কয়েকটি বড় কোম্পানির লোহা ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এখানে স্থাপনের ফলে হাওড়ার শিল্পাঞ্চলকে অনেকে বিলেতের বার্মিংহামের সঙ্গে তুলনা করেন। কেউবা বলেন ভারতের শেফিল্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বেলিলিয়াস রোড, নরসিংহ দত্ত রোড, গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড, কদমতলা ও দাশনগর প্রভৃতি স্থানে লোহার নানান দ্রব্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে ওঠে। লোহার পাশাপাশি এ্যালমুনিয়াম রোলিং শিল্পের জন্য নির্মিত কারখানাগুলি বেলুড়-এ কেন্দ্রীভূত।

এছাড়া শিবপুর, রামকৃষ্ণপুর ও হাওড়ায় বেশ কয়েকটি ময়দাকল এবং শালিমারে রঙ প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জেলায় ছাতা প্রস্তুতের কারখানা, রুটি, হোসিয়ারী, কাঁচ কারখানা ও প্লাষ্টিক দ্রব্যের কারখানা হাওড়া শহর, শালকিয়া ও শিবপুরের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮

যাতায়াত ও পরিবহন

ক. জেলার পথঘাট

এদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে হাওড়া জেলার পথঘাট নিয়ে কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। পলাশী যুদ্ধের পর বাংলায় বিদেশী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ রেনেলকে সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হয়ে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যে মানচিত্রটি প্রস্তুত করেন সেটিতে সুবে বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বহু পথঘাটের নিদর্শন দেখা যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, পলাশী যুদ্ধের পর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে শুধুমাত্র, 'ওল্ড মিলিটাবি রোড' ছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নতুন কোন রাস্তা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়নি। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, রেনেলের ম্যাপে উল্লিখিত পথঘাটগুলি ছিল সেকালের গ্রাম-গ্রামান্তরের মধ্যে যোগাযোগ মাধ্যম; পক্ষান্তরে অনুমান করা যেতে পারে, হিন্দু আমলে বা পাঠান-মোগলের রাজত্বকালে ও বাংলায় নবাবী আমলের প্রথমভাগে নির্মিত হয়েছিল ঐসব পথঘাট।

এখন রেনেলের মানচিত্রে দর্শিত রাস্তাগুলির বিবরণ থেকে দেখা যায়, ভাগীরথী তীরবর্তী শালিখা থেকে চারটি পথ এ জেলার চারদিকে প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি পথ এখান থেকে চলে গেছে উত্তরে বালী হয়ে শ্রীরামপুর, দ্বিতীয় পথটি উত্তর-পশ্চিমে হুগলী জেলার চণ্ডীতলা হয়ে ধনেখালি, তৃতীয় পথটি উত্তর-পশ্চিমমুখী মাকড়দহ-আলমপুর হয়ে হুগলী জেলার রাজবলহাট এবং চতুর্থ পথটি পশ্চিমমুখী শাঁকরাইল হয়ে বড়গাছিয়ার উপর দিয়ে আমতা; সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে খালনা হয়ে মানকুরের উপর দিয়ে রূপনারায়ণ নদ পেরিয়ে সোজা পশ্চিমে মেদিনীপুর। আর এই মানকুর থেকেই একটি পথ দক্ষিণ-পুবে চলে গেছে বাগনান। এছাড়া, আমতা থেকে আরও একটি পথ দামোদর পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে সোজা চলে গেছে মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে। তদুপরি আমতা থেকে প্রসারিত একটি সড়ক সোজা দক্ষিণে চলে এসেছে পূর্বে উল্লিখিত বাগনানে। আবার মিলিত এই উভয় পথের কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটি পথ উত্তর-পূবে এবং আর একটি পথ সোজা দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে। উত্তর-পুবের পথটি দামোদর পার হয়ে পূর্বদিকে পালড়া গ্রামের (থানা ঃ উলুবেড়িয়া) উপর দিয়ে সোজা চলে এসেছে ভাগীরথী তীরবর্তী উলুবেড়িয়াতে। অবশিষ্ট দক্ষিণের অন্য পথটি বাগনান থেকে সোজা দক্ষিণমুখী হয়ে চলে এসেছে বেনাপুর এবং সেখান থেকে রূপনারায়ণ নদ পেরিয়ে তমলুক। মানচিত্র থেকে বেশ বোঝা যায়, সে সময় আমতা ও বাগনান বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে পরিগণিত হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই রেনেলের ম্যাপে হাওড়া জেলার উপর দিয়ে প্রসারিত আলোচ্য এইসব পথগুলি যে সেকালের প্রাচীন পথের নিদর্শন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গতঃ রেনেল সাহেবের ম্যাপে দর্শিত পূর্বে উল্লিখিত তৃতীয় পথটি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্ভবতঃ সংস্কার সাধন করে 'ওল্ড মিলিটারি রোড' নামে আখ্যা দেয়। কিন্তু পূর্বে এটি 'বেনারস রোড' নামে কথিত ছিল। ১৭৮০ সাল নাগাদ রানী অহল্যাবাঈয়ের অর্থে এই পথ নির্মিত হওয়ায় এটিকে অহল্যাবাঈ রোড্ও বলা হ'ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই পথ দিয়ে বেনারস বা উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য স্থানে সৈন্য চলাচলের ব্যবস্থা করায় এটির নাম সে সময় হয়ে দাঁড়ায় 'ওল্ড মিলিটারি রোড্'। শালিখার বাঁধাঘাট থেকে এই অপ্রশস্ত রাস্তাটি সুরু হয়ে এই জেলার শেষ সীমানা জগদীশপুরের কাছে চড়িয়াল খাল পার হয়ে একদা হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছিল।

ওল্ড বেনারস রোড-এর পর হাওড়া জেলায় প্রসারিত আর একটি পথ হল 'গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড়'। এ রাস্তাটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গেলেই স্বাভাবিকভাবে শেরশাহের উদ্যোগের কথা মনে পড়ে, যিনি নাকি বাংলা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত এই পথ নির্মাণ করেছিলেন। সে যাই হোক্ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মের ডেপুটি অ্যাসিস্‌টেন্ট কোয়ার্টার মাষ্টার জেন্‌রল মেজর ফ্রেড রবার্টস-এর লিখিত এক বিবরণী থেকে জানা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত প্রসারিত এই গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডটি সে সময় সুরু হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম থেকে এবং তা চিৎপুরের উপর দিয়ে ব্যারাকপুর হয়ে ইছাপুরের কাছে ভাগীরথী পার হয়ে চন্দননগরের অন্তঃপাতী গেরেটির উপর দিয়ে বিস্তৃত ছিল। পরে ১৮৭৪ সালে হাওড়া-কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য হুগলী-ভাগীরথী নদীবক্ষে ভাসমান সেতু নির্মিত হওয়ায় শিবপুরের নিকটবর্তী বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে পূর্বে-উল্লিখিত গেরেটি পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয় এবং তার শেষ হয় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে ১৮৩১ সালে। সুতরাং নদী পারাপারের অসুবিধা দূরীভূত হওয়ায় পূর্বে বর্ণিত ভাগীরথীর পূবপারের ঐ পথটির বদলে, হাওড়া জেলায় বালী পর্যন্ত প্রসারিত এই পথটি চন্দননগরের কাছে গেরেটি পর্যন্ত যুক্ত হয়ে যাতায়াতের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায় এবং পরে এই রাস্তাটি গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড নামেও অভিহিত হয়। হাওড়ার এই গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডটির দূরত্ব হ'ল ৯.৬ কি.মি.।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে শ্রীক্ষেত্র গমনাগমনের উপযোগী উলুবেড়িয়া থেকে পুরী পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মিত হয়। এই সড়কটি নির্মাণের প্রয়োজনে কলকাতার পোস্তার ধনকুবের সুখময় রায় মহাশয় তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে সচিব ডাউডেসওয়েলকে প্রতিশ্রুতমত দেড় লক্ষ টাকা দেন ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। শর্ত থাকে যে, তাঁর এই বদান্যতার পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকবে সেতুর গায়ে পাথরের ফলকে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় এবং পথের ধারে ধারে উপযুক্তভাবে বৃক্ষরোপণ ও পথিকদের পানীয় জলের প্রয়োজনে পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ১৮১২ সালে এই পথটি নির্মাণের কাজ শুরু হলেও, মেদিনীপুর থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ ১৮২৫ সালে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। এ জেলায় রূপনারায়ণ তীরবর্তী নাউফালা থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত দূরত্ব দাঁড়ায় ২৪ কি.মি.। নির্মাণ শেষে এ রাস্তাটির নাম হয় ওড়িশা ট্র্যাঙ্ক রোড, যা সাধারণ লোকের কাছে কটক রোড নামেই সমধিক পরিচিত। উল্লেখ্য যে, রাস্তা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পথিমধ্যে বেশ কয়েকটি যাত্রী নিবাসও নির্মাণ করে দেওয়া হয়, যার মধ্যে এ জেলায় হাওড়ার চণ্ডীপুর ও নাউফালায় ছিল তেমন দু'টি যাত্রীনিবাস।

উপরি বর্ণিত এ পথগুলি ছাড়া আরও একটি প্রাচীন পথের নিদর্শন এখনও দেখা যায়। বাগনান থানার কাঁটাপুকুর থেকে দামোদর তীরবর্তী খাজুট্টি গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত একটি উঁচু বাঁধ। সাধারণ্যে এটিকে বেটবন সাহেবের বাঁধ বলে উল্লেখ করা হয়। পুরাতন কাগজপত্রে দেখা যায়, জে. ই. বেটবন সাহেব ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে মণ্ডলঘাট পরগণার 'পুলবান্দি' মেরামতের অধীক্ষক (Superintendent of Poolbundy Repairs)। তিনি কৃষির উপকারার্থে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণের কাজ যেমন তদারকি করেছেন, তেমনি যাতায়াতের সুবিধার জন্য নতুন পথও নির্মাণ করেছেন। জেলার বাগনান থানার পশ্চিমাঞ্চলটি সে সময়ে ছিল লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র। সুতরাং জলপথ ছাড়া স্থলপথে লবণ ইত্যাদি প্রেরণের জন্য আঠার শতকের শেষ দিকে তিনি যে বাঁধটি নির্মাণ

করেন, সাধারণ মানুষের কাছে আজও তা বেটবন সাহেবের বাঁধ। জেলা পরিষদ বর্তমানে যে সব রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন সে তালিকার মধ্যে এই পথটির নাম উল্লিখিত হয়েছে 'বেটম্যানস্ বান্ধ'। বর্তমানে এই বাঁধটি রাজ্য সরকারের পূর্ত (সড়ক) বিভাগের অধীন এবং এটির দূরত্ব প্রায় ১২ কি.মি.।

সাবেকী পথঘাট সম্পর্কে আলোচনাকালে উল্লিখিত পথঘাট ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাচীন পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পথগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের নাম জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও তাদের কোন পরিচয় জানা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জগৎবল্লভপুর থানার এলাকাধীন 'মুলুকচাঁদের জাঙ্গাল' নামে পরিচিত একটি পথ, যা মুন্সীরহাট থেকে উত্তরে প্রসারিত প্রায় ৩ কিমি. দূরত্ব বিশিষ্ট।

এই পর্যায়ের আর একটি পথ হল 'আতিমশার বেড়'। এ পথটি বাগনান থানার মুগকল্যাণ-হরিনারায়ণপুর হয়ে শ্যামপুর থানার কাঁটাগাছি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আদিতে যার দূরত্ব ছিল সম্ভবতঃ ১০ কি.মি.। বর্তমানে এ রাস্তাগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের নাম বিস্মৃত বললেই চলে।

১৯০৫ সালে জেলা গেজেটিয়ারে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, এ জেলায় আরও যে একটি পুরাতন পথ ছিল তা শিবপুর থেকে শুরু হয়ে শাঁকরাইল থানার মাহিয়াড়ী হয়ে ডোমজুড় এবং সেখান থেকে জগদীশপুর পর্যন্ত বিস্তৃত, যার দূরত্ব ছিল ২৭ কি.মি.।

বলা বাহুল্য, আলোচ্য এসব সাবেকী পথঘাটের বহুলাংশ বর্তমানে লুপ্ত বা পরিত্যক্ত এবং বাদ বাকী এসব পুরাতন পথগুলির অনেকাংশ আজ নতুন করে নির্মিত হয়েছে আধুনিককালের যানবাহনের সড়ক হিসাবে।

বর্তমানে এ জেলার উপর দিয়ে জাতীয় সড়ক ৬নং হাওড়া থেকে জেলার শেষ সীমানা রূপনারায়ণ তীরবর্তী নাউফালা গ্রামের উপর দিয়ে মেদিনীপুর অভিমুখে প্রসারিত হয়েছে।

খ. জলপথ

এ জেলায় রেলপথ প্রবর্তনের পূর্বে উলুবেড়িয়া থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত জলপথে যাতায়াতের জন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এক খাল খননের পরিকল্পনা করে এবং পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করার জন্য ইজারা দেন 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইরিগেশন অ্যাণ্ড ক্যানাল কোম্পানি' নামে এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে। ১৮৬০ সালে খাল কাটার কাজ শুরু হয় এবং পরিবহনের জন্য জলপথটি খুলে দেওয়া হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। সে সময় জলপথটির নামকরণ করা হয় 'মেদিনীপুর টাইড্যাল ক্যানেল', যা পরে এটি 'মেদিনীপুর ক্যানেল' নামে আখ্যাত হয়। কোম্পানির খনিত এই দীর্ঘ জলপথে চলতে থাকে নানা ধরনের ছোট-বড় নৌকো আর সেই সঙ্গে যাত্রীবহনের জন্য স্টিমার প্রভৃতি। কিন্তু এ জলপথ পরিবহনের আয়ু বেশীদিন টিকে থাকেনি। কাঁটাপুকুর গ্রামের কাছে রূপনারায়ণের সংযোগস্থলে এই খালের মুখে চড়া পড়তে শুরু করায় জলযানের পক্ষে যাতায়াতে অসুবিধে দেখা দেয়। এদিকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ চালু হয়ে যাওয়ায় এই জলপথ পরিবহনের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে এটি সেচখাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজও সে মজা খালটির অস্তিত্ব পুরানো দিনের জলপথ পরিবহনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এক সময়ে কলকাতার আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহর পর্যন্ত হোরমিলার কোম্পানির স্টিমার চলাচল করতো ভাগীরথী ও রূপনারায়ণ দিয়ে এবং

হাওড়া জেলার নানাস্থানে সেজন্য স্টিমার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তী বিশ শতকের প্রথম দিকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ প্রবর্তন হওয়ায়, এই স্টিমার সার্ভিস কোলাঘাট থেকে ঘাটাল পর্যন্ত চলাচল করে। বিদেশী হোর মিলার কোম্পানি ছাড়াও ১৯২৫ সালে দেশীয় মালিকানাধীন ঘাটাল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানিও পাশাপাশি কোলাঘাট থেকে ঘাটাল পর্যন্ত স্টিমার সার্ভিস চালু করে।

এছাড়া, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে হোরমিলার কোম্পানি চাঁদপালঘাট থেকে শিবপুর হয়ে শাঁকরাইল থানার রাজগঞ্জ পর্যন্ত যাত্রীবাহী স্টিমার সার্ভিস চালু করে ছিল। পরবর্তী সময়ে এই স্টিমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেলেও, উলুবেড়ে থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত এই কোম্পানির স্টিমার সার্ভিস বিগত পাঁচের দশক পর্যন্ত চালু থাকে।

আড়খেয়া পারাপারের জন্য শালিখা-আহিরীটোলা এবং রামকৃষ্ণপুর-চাঁদপালঘাট ফেরী সার্ভিস চালু থাকা সত্বেও, যানজট সমস্যা সমাধানে হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সাল নাগাদ সরকারী উদ্যোগে ফেরী সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। সেইমত বর্তমানে হাওড়া-আর্মেনিয়ানঘাট, হাওড়া-ফেয়ারলি, হাওড়া চাঁদপালঘাট, হাওড়া-স্ট্র্যাণ্ড রোড, হাওড়া-কাশীপুর, তেলকলঘাট-মেটিয়াবুরুজ, হাওড়া-বেলুড়, শিবপুর-চাঁদপালঘাট প্রভৃতি লঞ্চ সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

গ. রেলপথ ঃ

ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলী স্টেশন পর্যন্ত প্রথম রেলগাড়ি চালু করে এবং ১৮৫৫ সালে রানীগঞ্জ পর্যন্ত এই রেলপথ বিস্তৃত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথ কোম্পানি হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন চালু করে। এই শতকের পাঁচের দশকে ভারতীয় রেলপথ-এর অধীন এই বিভাগের নামকরণ করা হয় ইস্টার্ণ রেলওয়ে বা পূর্ব রেলপথ। হাওড়া স্টেশন থেকে এই জেলায় প্রসারিত পূর্ব রেলপথের স্টেশনগুলির মধ্যে মেন লাইনে আছে লিলুয়া, বেলুড় ও বালী স্টেশন এবং কর্ড লাইনে বালীঘাট ও বেলানগর স্টেশন।

প্রথম স্থাপিত হাওড়া ষ্টেশন ভবন

অন্যদিকে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি খড়্গপুর-হাওড়া রেলপথ চালু করে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে চালু করে সাঁতরাগাছি-শালিমার শাখা। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় রেলপথের অধীন এই বিভাগটির নামকরণ করা হয় সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে বা দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ। এই জেলায় প্রসারিত হাওড়া থেকে জেলার শেষ সীমানা পর্যন্ত

বর্তমান রেল স্টেশনগুলি হল, টিকিয়াপাড়া, দাশনগর, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, মৌড়িগ্রাম, আন্দুল, শাঁকরাইল, আবাদা, নলপুর, বাউড়িয়া, চেঙ্গাইল, ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, বীরশিবপুর, কুলগাছিয়া, বাগনান, ঘোড়াঘাটা ও দেউলটি।

মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি পরিচালিত ন্যারো গেজ হাওড়া-আমতা লাইট রেলপথ ১৯৭১ সালে উঠে যাওয়ার পর হাওড়া থেকে আমতা পর্যন্ত ব্রড্‌গেজ রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনামত দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ হাওড়া থেকে বড়গাছিয়া পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ করেছেন।

মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানির পরিচালনায় ছোট লাইনের মিটার গেজ হাওড়া-আমতা রেলপথ ১৮৯৮-৯৯ সালে ও হাওড়া-শিয়াখালা রেলপথ চালু হয় ১৮৯৭ সালে এবং বড়গাছিয়া থেকে হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গা পর্যন্ত হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা শাখা রেলপথের সম্প্রসারণ করা হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই তিনটি রেলপথের প্রান্তীয় স্টেশন ছিল প্রথমে

মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানির ছোট রেলগাড়ি (১৯৩০)

তেলকলঘাট। পরে কদমতলায় উঠে গেলেও আরও পরবর্তী সময়ে এটি স্থানান্তরিত হয় হাওড়া ময়দানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। দুঃখের কথা, ক্রমাগত লোকসানের কারণে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথগুলি তুলে দেওয়া হয়।

ঘ. ট্রামপথ ঃ

অনুরূপ, একদা ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি যাত্রী পরিবহনের উদ্দেশ্যে যে ইলেকট্রিক ট্রাম চালু করেছিল সেটিও পরবর্তীকালে তুলে দেওয়া হয়। অথচ একদিন ১৯০৮ সালে হাওড়া-শিবপুর শাখায় এবং হাওড়া-বাঁধাঘাট শাখায় গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ও হাওড়া রোড হয়ে উল্লিখিত কোম্পানির পক্ষে ট্রামগাড়ি চালু করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ট্রাম কোম্পানি অধিগ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৭০ সালে হাওড়া-বাঁধাঘাট লাইন এবং ১৯৭১ সালে হাওড়া-শিবপুর লাইনের ট্রাম চলা অলাভজনক বিধায় বন্ধ করে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলকাতার

সঙ্গে হাওড়ার যোগাযোগের জন্য রবীন্দ্র সেতুর উপর দিয়ে বিভিন্ন রুটের যে ট্রাম চলাচল করতো, বর্তমানে সেটিকেও তুলে দেওয়া হয়েছে এবং ট্রাম কলকাতার বড়বাজার থেকে অন্যান্য স্থানে বর্তমানে চলাচল করে।

ঙ. সেতু ঃ

হাওড়া জেলায় প্রবাহিত বেশ কিছু নদী-খাল পারাপারের জন্য যে সব সেতু নির্মিত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে উপযুক্ত সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণপূর্ব রেলপথের উপর বাকল্যাণ্ড ব্রীজ নামে হাওড়া শহরের সঙ্গে সংযোগকারী যে সেতুটি আছে তা নির্মিত হয় ১৮৮৪ সালে এবং ১৯০৪ সালে ট্রাম চলাচলের জন্য সেটিকে পুনর্গঠিত করা হয়। ভারতের স্বাধীনতার পর বর্তমানে এর নামকরণ করা হয়েছে ঋষি বঙ্কিম সেতু। তবে ১৯৮০ সালে পুরাতন সে সেতুটি ভেঙ্গে ফেলে তার পাশে নতুন করে বর্তমান সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যদিকে কলকাতার সঙ্গে সংযোগের জন্য ভাগীরথী বক্ষে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে ভাসমান সেতুটি নির্মাণ করা হয় সেই হাওড়া সেতুটি
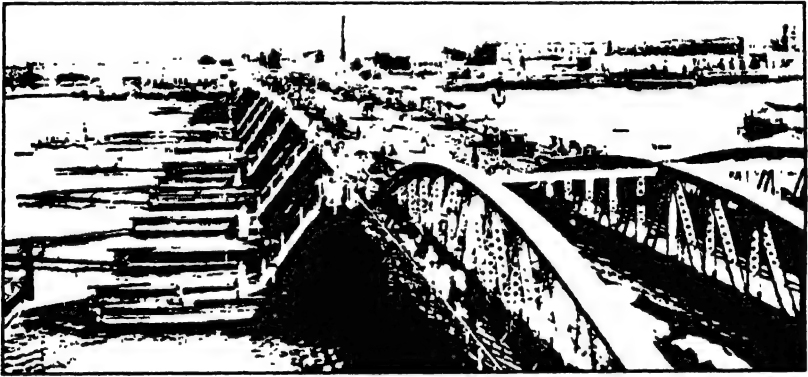
হাওড়ার ভাসমান সেতু, বর্তমানে বিলুপ্ত

নির্মাণের সত্তর বছর পরে বাতিল করে দেওয়া হয়। পরিবর্তে সে সেতুর উত্তর পাশে বর্তমান এই ক্যান্টিলিভার সেতুটি নির্মাণ করে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং বর্তমানে এই সেতুর নাম হাওড়া ব্রীজের পরিবর্তে রবীন্দ্র সেতু নামকরণ করা হয়েছে।

এছাড়া ভাগীরথী বক্ষে কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটের কাছ থেকে জাতীয় সড়ক ৬নং-এর সঙ্গে সহজে যোগাযোগের জন্য বিগত সালে নির্মাণ করা হয়েছে দ্বিতীয় হুগলী সেতু যার বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে বিদ্যাসাগর সেতু।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হাওড়ার বালী ও দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে সংযোগকারী ভাগীরথী বক্ষে নির্মিত হয় উইলিঙ্গডন ব্রিজ, যা বর্তমানে সেটি বিবেকানন্দ সেতু নামে নামাঙ্কিত। এ সেতুর উপর দিয়ে পথচারী ও যানবাহন ছাড়াও পূর্ব রেলপথের ট্রেন চলাচল করে।

জেলার পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবাহিত রূপনারায়ণ নদের উপর জাতীয় সড়ক ৬নং এর সংযোগকারী ৭৩১.৫ মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সেতুটি নির্মিত হয়েছে বিগত ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, বর্তমানে যার নামকরণ করা হয়েছে শরৎ সেতু। এই সেতুর পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সংযোগকারী পূর্বের রূপনারায়ণ সেতুর দক্ষিণ পাশে নতুন করে আরও একটি সেতু নির্মিত হয়েছে।

৯

ব্যাঙ্ক, ব্যবসা ও বাণিজ্য

সেকালে কৃষিঋণদানের জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ চাষী ও ক্ষেতমজুর সম্প্রদায়কে ঋণের জন্য নির্ভর করতে হত গ্রাম্য কুশিদজীবী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের উপর। এর ফলে চড়া সুদে যেমন ঋণ গ্রহণ করতে হ'ত তেমনি বেশি টাকার ঋণ হলে জামিন হিসেবে জমি জায়গা বা সোনাদানা মহাজনদের কাছে বন্ধক রাখতে হ'ত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধিত না হলে পরবর্তী পর্যায়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গণনা করা হত এবং তা পরিশোধ না করা হলে মহাজন-উত্তমর্ণরা আদালতের আশ্রয় নিতেন। এ ছাড়া জেলার শিল্পকারখানার শ্রমিকেরা শতকরা প্রায় তিরিশ ভাগ কাবুলিআলা বা স্থানীয় মহাজনদের কাছে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে থাকতো এবং অনেক সময় সুদ-আসল শোধ করতে না পারলে তারা সাময়কিভাবে গা ঢাকা দিত।

পরবর্তী সময়ে এ জেলার শহরাঞ্চলে ও মফঃস্বলে কিছু কিছু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সেগুলি সাধারণের সঞ্চয় প্রচেষ্টায় সহায়ক হয়ে দেখা দেয়। অতীতে উনিশ শতকের শেষ বা বিশ শতকের সুরুতে এ জেলায় দেশী মালিকানায় বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে আমতা থানার চিংড়াজোলের মাহিষ্য ট্রেডিং ব্যাঙ্ক, বাগনান থানার পূর্ণাল পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্ক, কদমতলার যাদব সমবায় ব্যাঙ্ক ও দাশনগরের দাশ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও এসব ব্যাঙ্কগুলির কোনটিরই স্থায়িত্ব বেশিদিন ছিল না।

বর্তমানে এ জেলায় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেগুলি হল, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কৃষি ও কৃষির সরঞ্জাম ক্রয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য কুটির শিল্প এবং অন্যবিধ ব্যবসায়ের জন্য যথাযথ ঋণ মঞ্জুরপুর্বক সহায়তা দানের জন্য মহাজন ও উত্তমর্ণদের চড়া সুদের থেকে ঋণগ্রহীতারা রক্ষা পেয়েছেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ছাড়াও হাওড়ার শহরে ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতি পরিচালিত কৃষি ঋণদান সমিতি ও অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জেলার সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত উলুবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নামে পুনর্গঠিত হয়, যা এ জেলার একমাত্র বৃহৎ সমবায় ব্যাঙ্ক। জেলার বিভিন্ন গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলিকে এই ব্যাঙ্ক কৃষিকার্য ও অন্যবিধ খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এ জেলার আর একটি সমবায় ব্যাঙ্ক হল, ব্যাঁটরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। বর্তমানে পঞ্চায়েত সমিতি থেকেও চাষবাস, চাষের বলদ ক্রয়, সার ক্রয় প্রভৃতি বাবদ কৃষকদের ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ভারতের জীবন বিমা নিগমও জনগণের মধ্যে তাদের বিমা প্রকল্প ইত্যাদি কার্যধারা বিস্তৃত করার জন্য জেলার সদর ছাড়াও শিবপুর, উলুবেড়িয়া ও বাগনানে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়া, জেলার বিভিন্ন ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক বাদেও

জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সঞ্চয় জমা প্রকল্পও চালু আছে। বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা হিসাবে ঋণ প্রদান করে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন এবং ভারতের ইনড্রাসটিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া।

জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনায় এলে দেখা যায়, হাওড়া জেলার কৃষিজাত ও পশুপালন বাবত পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্র হল বিভিন্ন গ্রাম্য হাট-বাজার ও মেলা এবং শহর এলাকায় বাজার প্রভৃতি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ধান, পান, শাকসব্জী ও গবাদি পশু প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীভূত স্থান হল উলুবেড়িয়া মহকুমা এবং অন্যদিকে বিক্রয়ার্থে আমদানীকৃত পাট, শাকসব্জী, নারিকেল, পান, চাল, ডাল, তৈলবীজ ও মাছের কেন্দ্রীভূত স্থান হ'ল হাওড়ার সদর মহকুমা। এ জেলায় ধানের উৎপাদন তেমন আশানুরূপ না হওয়ায় ঘাটতি পূরণের জন্য মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, দুধকোমরা ও ঐ জেলার অন্যান্য স্থান থেকে ধান-চাল বিশেষভাবে আমদানী করা হয় বাগনান থানার বাকসীর হাটে। বিভিন্ন জেলা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানীকৃত চালের এক বড় আড়ত হল রামকৃষ্ণপুর এবং সেখানে আড়তদারদের গুদামঘর থাকায় স্থানটি পাইকারী বেচাকেনার এক বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পূর্বে এ জেলার শ্যামপুর ও বাগনান থানায় বেশ কয়েকটি রাইসমিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ধানের আমদানীর উপর সরকারী বিধিনিষেধের ফলে এইসব চালকলগুলি উঠে যায়।

এ জেলায় উৎপাদিত কাঁচা পাটের ৩/৪ ভাগ ফড়ে, পাইকার ও ব্যাপারীরা চাষীদের কাছ থেকে ক্রয় করে এবং বাদবাকী ১/৪ ভাগ বিভিন্ন হাটে বিক্রয়ের জন্য আনা হয়। ডাল ও তৈলবীজ বিহার, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও চেন্নাই থেকে রেলপথযোগে যা হাওড়ায় চালান আসে, তা হাওড়া, রামকৃষ্ণপুর ও শালিমার-এর রেল ইয়ার্ডের গুদামে প্রথমে জমা হয়। তারপর সেখান থেকে রেলের প্রাপ্য মাশুল আদায় দিয়ে ব্যাপারীরা বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে চালান দেয়।

হাওড়া স্টেশনের নিকটবর্তী যেস্থানে মাছের বাজার বসে তার নামকরণ হয়েছে হাওড়া ব্রিজ ফিস মার্কেট। এখানে চালান আসা মাছ খোলা নিলাম মারফৎ আড়তদাররা বিক্রয় করে থাকেন। সাধারণত এইসব মাছ রেলযোগে চালান আসে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা ও কানপুর, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, চেন্নাই, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য থেকে। বর্তমানে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ভ্যান-লরীতে মাছ চালান আসছে।

আমদানী করা ছাড়া, এ জেলা থেকে যে সব দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয় তার মধ্যে পাট চালান যায় কলকাতা সন্নিহিত বিভিন্ন চটকলে, শুকনো নারিকেল যায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাবে এবং পান চালান যায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মুম্বই ও আসামে। এছাড়া রামকৃষ্ণপুর থেকে চাল, কালীবাবুর বাজার থেকে আলু, মাছ ও শাকসব্জী, হাওড়া ব্রিজ ফিস মার্কেট থেকে মাছ, বাগনান ও খালোড় পানপোস্তা থেকে পান, ডোমজুড় থেকে পাট এবং শাঁকরাইল থেকে ডাব ও নারিকেল প্রভৃতি অন্যান্য

জেলায় চালান যায়। উল্লেখ্য যে, হাওড়ার ডাল ও তৈলবীজের বাজার ভারতের মধ্যে এক বৃহৎ বাজার বলে গণ্য করা হয়।

বস্ত্রশিল্পের এক বৃহৎ হাট বসে হাওড়ায়, যা হাওড়া হাট নামে পরিচিত এবং প্রতি মঙ্গলবার বসার জন্য এটিকে মঙ্গলা হাট নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। মঙ্গলা হাটটি বেশ প্রাচীন যা নাকি দেড়শো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। এই হাটটিতে হুগলী, বধর্মান, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলা থেকে ধুতি, শাড়ি, মশারী ও গামছা প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য আসে। বিছানার চাদর ও তোয়ালে গামছা প্রভৃতি চালান আসে বাঁকুড়া জেলার নানাস্থান থেকে এবং রেশম ও তসর জাতীয় বস্ত্র চালান আসে পুরুলিয়া জেলা এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থান থেকে। উল্লেখ্য যে, এখানকার সম্পূর্ণ ব্যবসাটির অর্ধেক পরিচালিত হয় মহাজনদের দ্বারা এবং বাকী অর্ধেক তাঁতশিল্পী ও বেচাকেনার দালাল দ্বারা।

অন্যদিকে এই হাটের মিমানি অংশটিতে বিক্রয় হয় হাওড়া, হুগলী, কলকাতা, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আনীত নানাবিধ তৈরি পরিধান বস্ত্র জামা, প্যান্ট ও ইজের প্রভৃতি এবং এগুলি পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা তো বটেই, এমনকি ত্রিপুরা, আসাম, বিহার ও ওড়িশার নানাস্থানে চালান যায়। এছাড়া, সংলগ্ন গণেশ মঙ্গলাহাটে বিক্রয় হয় হোসিয়ারী দ্বারা প্রস্তুত গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি, যা বিক্রয়ার্থে চালান আসে কলকাতার বড়বাজার, শোভাবাজার ও ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থান থেকে এবং এখান থেকে চালান যায় দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও আসামে।

সর্বোপরি, এ জেলায় বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত গ্রাম্য মেলাগুলিতে বিক্রয়ার্থে আসে কুটির ও হস্তশিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্যের পসরা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হাওড়া হোলসেল কনজিউমারস্ সোসাইটি, যেটি জেলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় করে থাকে।

১০

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

হাওড়া জেলায় জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনার সুরুতেই বলা যায়, অতীতে এ জেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে প্রচলিত ছিল কবিরাজি ও হেকিমি চিকিৎসা। অন্যদিকে নানান অসুখবিসুখ নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থা ছিল দেবদেবীর কাছে মানত নির্ভর দৈব চিকিৎসা। উদাহরণ সহযোগে বলা যেতে পারে, গ্রামের সাধারণ মানুষজন যেমন বসন্ত দেখা দিলে দেবী শীতলার কাছে এবং কলেরা হলে ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবির কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা জানাতেন, তেমনি শিশুদের রোগমুক্তির আশায় পঞ্চানন্দ, জ্বরাসুর ও মা ষষ্ঠীর কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে মানত করতেন এবং যথারীতি পূজোও দিতেন। অনেক সময় দৈব চিকিৎসার নামে দেবতাদের সেবাইত বা পুরোহিতরা রোগীদের জলপড়া দিতেন বা শিকড়বাকড় জাতীয় ঔষুধও প্রদান করতেন। এ জেলার দু'একটি শিবমন্দিরে রোগ নিরাময়ের আশায় উপবাস করে দেবতার কাছে অনেকে হত্যা দিতেন। রোগা ক্ষীণ চেহারা থেকে মোটা বা বলবান হওয়ার আশায় মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে এ জেলার বাঁটুল গ্রামে (থানা ঃ বাগনান) মোটাপুকুর নামে এক ক্ষুদ্র জলখাতে স্নান করে পরনের বস্ত্র পরিত্যাগ করে চলে আসার প্রথা আজও বর্তমান আছে।

বেশ বোঝা যায়, অতীতে আধুনিক চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত না থাকায় রোগ নিরাময়ের জন্য সাধারণ মানুষের এই সব লৌকিক দেবদেবীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, হাওড়া শহরের নগরায়নের ফলে বহু কিছু পরিবর্তন হলেও দৈব নির্ভরতার গুণে এইসব লৌকিক দেবদেবীরা আজও কিন্তু স্বস্থানে বহাল থেকে গেছেন। উদাহরণ হল, পঞ্চাননতলা রোড ও খুরুটের (নেপাল সাহা লেন) পঞ্চানন্দ, কাসুন্দিয়ার ওলাবিবি, নেতাজী সুভাষ রোডের (পূর্বতন খুরুট) দুটি দক্ষিণ রায়, বেতড়ের বেতাই চণ্ডী, বাঁশতলা শ্মশান, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, হরগঞ্জ বাজার ও শম্ভু হালদার লেনের শীতলা এবং খুরুট, শালকিয়া ও শিবপুরের ধর্মঠাকুব প্রভৃতি দেবদেবী আজও স্বমহিমায় বর্তমান।

বিগত বিশ শতকের শুরু থেকে এ জেলায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তার আগে উনিশ শতকের শেষ দিকে এ জেলার জগৎবল্লভপুর থানার ধসা ও বাকুল গ্রাম আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এক বড়ো কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। ধসা গ্রামের কমলকান্ত ভরণ ছিলেন একজন বিখ্যাত কবিরাজী চিকিৎসক, যিনি রোগীর নাড়ী টিপে রোগ নির্ণয় করতেন এবং জ্বর-জ্বালা, ঘা-ফোঁড়া, পেটের নানাবিধ রোগ, টাইফয়েড্ ও নিউমোনিয়া প্রভৃতি অসুখবিসুখে আয়ুর্বেদীয় ঔষুধ প্রয়োগ করে রোগ নিরাময় করে তুলতে সক্ষম হতেন। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের আদমসুমার অনুযায়ী জানা যায় যে, এ জেলায় শহরাঞ্চলে ১১৮ জন এবং গ্রামাঞ্চলে ১৭৬ জন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক কবিরাজী চিকিৎসা করতেন। হাওড়ায় পূর্বে কোন আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল ছিল না। তবে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শালকিয়ার জেলেপাতায় তদানীন্তন হাওড়া পৌরসভা একটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করে।

এ জেলায় নানাবিধ জ্বর-জ্বালার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ম্যালেরিয়া (সে সময়ে বর্ধমান জ্বর নামে খ্যাত) মহামারী আকারে দেখা দেয়। ১৮৮১ সাল নাগাদ এ জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক এই কুখ্যাত জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ১৮৭২-৮১ সালে বিশেষ করে জেলার পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর, উদয়নারায়ণপুর ও আমতা থানা এলাকা এই রোগের প্রকোপে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, কলেরা বসন্তের মত মহামারী তো প্রতি বছর লেগেই ছিল। তদুপরি আমাশয় ও নানাবিধ পেটের পীড়া তো ছিলই। এমন কি ১৯৫০ সালে এ জেলায় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১,৭৮১ জন মারা পড়ে। অনুরূপ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে গুটি বসন্তে এ জেলায় প্রাণহানি ঘটে ৩,২৯৯ জনের। আসলে ইংরেজ রাজত্বে জল নিকাশীর সুবন্দোবস্ত না করে উঁচু বাঁধরাস্তা বা রেল লাইন নির্মাণ করার ফলে বহু স্থান জলে ডুবে থাকায় মশাবৃদ্ধির কারণে এই ম্যালেরিয়া মহামারীর সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাবে পুকুর বা দিঘির জল পান করার ফলে কলেরা ও আমাশয় প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া শহরে প্রথম প্লেগ মহামারী দেখা দেয় বটে, তবে পরবর্তী ১৯০৫ সালে এ জেলার শহরাঞ্চলে প্লেগ মহামারীতে ১,২৭৭ জন মারা পড়ে। ১৯৪৯ সালে পুনরায় এই অসুখটি দেখা দেয় এবং সে সময়ে সাতজন আক্রান্ত ব্যক্তির এই অসুখে জীবনান্ত ঘটে। ১৯৫১ সালে প্রতিষেধক হিসাবে প্রায় ৪২ হাজার মানুষকে প্লেগ বিরোধী টিকা দেওয়া হয়।

হাওড়া জেলায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার প্রবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় এলে দেখা যায়, বিগত ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থ নাবিকদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা ও কলকাতার ব্যবসায়ীদের বদান্যতায় নদীতীরবর্তী হাওড়া ঘাটের কাছে এক ভাড়াবাড়িতে 'সিমেন্স হাসপাতাল' নামে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়। পরবর্তী ১৮৫১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির রেলপথ প্রতিষ্ঠার কারণে এই হাসপাতালটিকে চাঁদমারি এলাকায় স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয় এবং রেলপথ কোম্পানির অসুস্থ কর্মচারিদেরও এইসঙ্গে চিকিৎসা করার ব্যবস্থাও রাখা হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকে।

পরবর্তী পর্যায়ে হাওড়া শহর এলাকার অন্যান্য নাগরিকদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য একটি জেনারেল হাসপাতাল খোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ১৮৬১ সালের ৭ই মে তারিখে গথিক স্থাপত্য অনুসারী সে হাসপাতাল ভবনের উদ্বোধন হয়। উল্লেখ্য যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই হাসপাতালটি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক কার্যনির্বাহিক সমিতির দ্বারা পরিচালিত হলেও, ১৯৪৫ সালে রাজ্য সরকার এই হাসপাতাল পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া শহরে প্রথম প্লেগ মহামারী দেখা দেওয়ায় প্লেগ রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য শালকিয়ার কাছে একটি পৃথকীকরণ হাসপাতাল খোলা হয়। ১৯২৯-৩০

খ্রীষ্টাব্দে ঐ হাসপাতালের গোলপাতার ছাউনিযুক্ত কাঁচা বাড়িগুলির সংস্কার করে পথচারী দুঃস্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়। পরে ১৯৪৫ সালে কলকাতার শ্রীমতী সত্যবালা দেবীর প্রদত্ত ভবন নির্মাণ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় বাবত দান হিসাবে পাওয়া একলক্ষ টাকায় মিউনিসিপ্যালিটি প্রদত্ত জমিতে সত্যবালা দেবীর নামে যে হাসপাতালটি তৈরি হয় তা মূলতঃ কলেরা, বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্য এবং হাসপাতালটির উদ্বোধন হয় ১৯৫১ সালের ২১শে জুন।

বর্তমান শতকের শুরুতে সরকারী প্রচেষ্টায় হাওড়া জেলায় যে সাতটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, তার মধ্যে ডিউক দাতব্য চিকিৎসালয়টি বর্তমানে লুপ্ত। এছাড়া বালীতে সেখানকার পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বিমস্ চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি স্থাপন ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে তদানীন্তন জেলা বোর্ড পরিচালিত শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া, আমতা ও অমবাগড়িতে চারটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এছাড়া, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লিলুয়ায় প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীরোগবিদ্যা সংক্রান্ত তুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী জয়সোয়াল হাসপাতালটির দায়িত্বভার ১৯৬৪ সালে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন।

বর্তমানে হাওড়া জেলায় সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জেলা হাসপাতাল ৩টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ১২টি, সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৮টি; চিকিৎসাকেন্দ্র ও ডাক্তারখানা ১৭১টি এবং মহকুমা স্বাস্থ্য কেন্দ্রর সংখ্যা ৩টি। এই সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দেখভালের দায়িত্বে আছেন জেলার চীফ মেডিক্যাল অফিসার। অন্যদিকে কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের অধীন উলুবেড়িয়া ও বালটিকুরিতে দুটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ জেলার বিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের পৈত্রিক নিবাস ছিল জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি এম. ডি. হলেও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার একান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তর হাওড়া শহর এলাকায় দশটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল স্থাপন করে। রামরাজাতলায় স্থাপিত সে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালটি হাওড়া ময়দানের কাছে উঠে আসার পর সেটির নামকরণ হয় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

জেলার ডাক্তারী চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশাসনিক দায়িত্ব বর্তমানে জেলা চীফ মেডিক্যাল অফিসারের উপর ন্যস্ত রয়েছে। তাকে সহায়তা করার জন্য যে দুজন আধিকারিক রয়েছেন তাদের একজন হলেন জেলা মেডিক্যাল অফিসার, যার দায়িত্ব ব্যাধি নিরাময় বিষয় দেখাশোনা করা এবং অন্যজন হলেন জেলা হেলথ অফিসার, যিনি স্থানীয় পরিবেশ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছাড়াও মহামারী প্রতিরোধ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিবারণ, স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় দেখভালের জন্য ভারপ্রাপ্ত। পূর্বে এই কাজ জেলা বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ১৯৫৯ সাল থেকে এটি জেলার চীফ মেডিক্যাল অফিসারের অধীনে আনা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে জেলা বোর্ড যখন জেলা পরিষদে রূপান্তরিত হয়, তখন জেলা

পরিষদ নিজস্ব তহবিল থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ বিষয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পূর্বতন জেলা বোর্ড, ১৮৭৭ সালে পূর্বতন হাওড়া পৌরসভা এবং ১৯২১ সালে বালী পৌরসভা জেলার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করে।

অতীতে হাওড়া শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে শিবপুর নিবাসী বসন্তকুমার পাল রচিত 'স্মৃতির অর্ঘ্য' আত্মচরিতে (১৮৮০ খ্রীঃ) লেখা হয়েছে যে, "আমাদের খাবার জলের জন্য তখন গঙ্গাজলের ভারী ছিল। তারা সব বেশীর ভাগ উৎকলবাসী। এক পয়সা কি এরকম দিলে একভার গঙ্গাজল বাড়ীতে দিয়ে যেত। সেই জল আমরা বড় বড় জালার মধ্যে রেখে দিতাম। .... সে সব জলে কখনও পোকা ধরত না। অনেকদিন পর্যন্ত পরিষ্কার থাকত, অপর সব কাজ হত পুকুর জলে।"

হাওড়া শহরে পরিশ্রুত জল সরবরাহের জন্য পূর্বতন হাওড়া পুরসভা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাগীরথী তীরবর্তী শ্রীরামপুরে পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করে। সেখান থেকে পরিশ্রুত জল পঞ্চাননতলা রোড, শালকিয়া, কৈপুকুর ও শিবপুরে স্থাপিত জলের ট্যাঙ্ক মারফৎ বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জলের অপ্রতুলতার দরুণ পরবর্তী সময়ে সি.এম.ডি.এ. বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটি পাম্প হাউস এবং পদ্মপুকুরে দৈনিক ৪০০ লক্ষ গ্যালন জল মজুতের উপযোগী একটি জলাধার নির্মাণ করে। হাওড়া পৌর নিগম এলাকা ছাড়া সি.এম.ডি.এ বৃহত্তর কলকাতা এলাকার মধ্যে হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে জলাধারসহ নলকূপভিত্তিক জলপ্রকল্প চালু করেছে।

হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে একসময় পানীয় জলের জন্য নির্ভর করতে হ'ত স্থানীয় পুষ্করিণী বা বড় দিঘির উপর। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গ্রামে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ এবং তপশীলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে নলকূপ দ্বারা পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে হাওড়া জেলা পরিষদও জেলার জনবসতিপূর্ণ শহর এলাকাতেও জলাধার সহ নলকূপ মারফৎ জল উত্তোলনপূর্বক পাইপ দ্বারা বিভিন্ন স্থানে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে।

১১

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ক. প্রাচীন মূর্তি-ভাস্কর্য

হাওড়া জেলায় পাল-সেন আমলে যে বেশ কিছু পাথরের মন্দির নির্মিত এবং সে সব মন্দিরে বেশ কিছু পাথরের মূর্তি বিগ্রহও যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ইতিপূর্বে 'প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ ও ইতিহাস' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মোট কথা এ জেলার নানাস্থানে প্রস্তর-ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবে বিভিন্ন দেবদেবীর পাথরের মূর্তি যেমন পাওয়া গেছে, অন্যদিকে পাথরের মন্দিরে ব্যবহৃত দ্বারপার্শ্ব ও দ্বারশীর্ষ ও রথপগযুক্ত পাথরের খণ্ডাংশও জেলার বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ. জেলার ধর্মীয় স্থাপত্য ঃ মন্দির, মসজিদ ও গির্জা

হাওড়া জেলায় মন্দির দেবালয়ের সংখ্যাও কম নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ জেলায় প্রাচীন মন্দির অটুট অবস্থায় পাওয়া না গেলেও সে সব মন্দিরে ব্যবহৃত বেশ কিছু খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে। সেজন্য প্রাচীন মন্দির লুপ্ত হলেও খ্রীষ্টীয় সতের শতক থেকে নির্মিত বেশ কিছু মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। সেসব মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, এজেলার মন্দির প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন প্রধানতঃ জমির উপসত্ত্বভোগী, জমিদারের কর্মচারী অথবা রেশম ও সুতীবস্ত্র, লবণ, দুধ, মাদকদ্রব্য ও গুড় ব্যবসায়ী কিংবা পূজারী ও কুলপুরোহিত প্রভৃতি। এছাড়া সরজমিন অনুসন্ধানে জানা যায়, এ জেলায় চুনবালির পলস্তারাবৃত মন্দির পোড়ামাটির নকশাযুক্ত মন্দিরের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। অন্যদিকে মোট ২৩৪টি মন্দিরের মধ্যে মাত্র ৬৮টি পোড়ামাটির সজ্জা সমন্বিত।

এ জেলার দেবালয়গুলি প্রধানতঃ বাংলা-রীতির 'চালা', 'রত্ন' ও 'দালান' শ্রেণীর হলেও ওড়িশায় বিবর্তিত রূপের সরলীকৃত পদ্ধতিতে কিছু কিছু শিখর মন্দিরও এখানে নির্মিত হয়েছিল। এখন এইসব শ্রেণীর মধ্যে চালা মন্দির হল, গ্রাম-বাংলায় বাঁশ কাঠ ও খড়ের ঘরের অনুকরণে নির্মিত মন্দির। দুটি চালাযুক্ত এমন মন্দিরই হল দোচালা মন্দির, যা কখনও একবাংলা নামে পরিচিত ছিল। এ জেলার আমতা থানার রাউতাড়া গ্রামে মানিকপীরের দরগাটি হল এ জেলায় দোচালা রীতির একমাত্র ইমারত। আবার দুটি দোচালাকে পাশাপাশি স্থাপন করে যে ধরনের মন্দিরটি তৈরি করা হত, তাকে বলা হত জোড়বাংলা। জোড়বাংলা মন্দিরের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে পাঁচলা থানার অন্তর্গত গোন্দলপাড়া গ্রামে। চারচালা কুঁড়েঘরের অনুকরণে গঠিত 'চারচালা' মন্দিরও এ জেলায় সংখ্যাতেও কম। এর মধ্যে নাম করা যেতে পারে সুলতানপুর ও ক্ষিরীশবেড়ের (থানা ঃ শ্যামপুর) চারচালা মন্দির। গ্রাম বাংলার আটচালা কুঁড়েঘরের আদলে নির্মিত 'আটচালা' মন্দিরের সংখ্যাই এ জেলায় সর্বাধিক। এ জেলায় নির্মিত এ রীতির বিখ্যাত মন্দিরগুলি অমরাগড়ি, আমতা, কল্যাণচক, খড়িয়প, খালনা, গড় ভবানীপুর, গাজীপুর, জগৎবল্লভপুর, জয়পুর, ঝিখিরা, ধসা, নিজবালিয়া, পাতিহাল, চন্দ্রভাগ, পেঁড়ো, বরুইপুর, বামুনপাড়া, বালী, ভাণ্ডারগাছা, মহিষামুড়ি, মাকড়দহ, মানিকারা, মেল্লক, রাউতাড়া, রাধাপুর, রামেশ্বরপুর, সিংটি, হরালী প্রভৃতি গ্রামে অবস্থিত। গ্রামীণ আটচালা বা চারচালা কুঁড়েঘরের সামনে যেমন তিনচালা একটি বাড়তি বারান্দা থাকে, সেই ধরনে গঠিত দেবালয়ের দৃষ্টান্ত নিজবালিয়া গ্রামের সিংহবাহিনী, ধসা গ্রামের গোপীনাথ জীউ এবং জয়পুর গ্রামের জলেশ্বর শিবমন্দির।

আটচালার শীর্ষে আরও এক প্রস্থ চারবালার সংযোজনে যে বারচালার সৃষ্টি হয় তার উদাহরণ হল, দেউলপুর ও রাউতাড়া গ্রামে এই ধরনের দুটি মন্দির।

'চালা' মন্দিরের মত 'রত্ন' মন্দিরের কার্ণিস বাঁকানো এবং ছাদ ঢালু হলেও তার স্থাপত্যরীতিতে বেশ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। ছাদের কেন্দ্রে ছোট একটি চূড়া নির্মাণ করলে হয় একরত্ন এবং সেটিকে ঘিরে ছাদের চার কোণে ক্ষুদ্রতর আর চারটি চূড়া স্থাপন করলে হয় পঞ্চরত্ন মন্দির। এক্ষেত্রে চূড়া ও রত্ন সমার্থক। এইভাবে মন্দিরতলের সংখ্যা বাড়িয়ে বা প্রতি তলের কোণে কোণে চূড়ার সংখ্যা বর্ধিত করে পঁচিশরত্ন মন্দিরও নির্মিত হতে পারে যার নিদর্শন হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় এখনও দেখা যায়। হাওড়া জেলায় রত্ন মন্দিরের মধ্যে নবরত্ন মন্দিরই আদৃত হয়েছে বেশী। এ জেলায় নবরত্ন মন্দিরের সংখ্যা চৌদ্দ এবং পঞ্চরত্ন মন্দিব মাত্র ছটি। জেলার এসব রত্নমন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আসণ্ডা, কল্যাণপুর, কুলিয়া, গজা, গণেশপুর, গোবিন্দপুর, ঝিখিরা, পাতিহাল, যাদববাটী ও সীতাপুর গ্রামের মন্দির। উল্লেখ্য যে, পাতিহাল ও সীতাপুরের মন্দির দুটি পঞ্চরত্ন ছাড়া বাকীগুলি নবরত্ন রীতির। রত্ন মন্দির স্থাপত্যের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল গোবিন্দপুরের মন্দির, যার গর্ভগৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ পথ ছাড়াও পূর্ব ও দক্ষিণেও ত্রিখিলান অলিন্দ রয়েছে।

বাংলা রীতির প্রথাগত স্থাপত্যের এসব নিদর্শন ছাড়াও, ওড়িশা থেকে আহৃত 'নাগর শৈলীর' বিবর্তিত রূপ অনুসারী শিখর-দেউল এ দেশের পেঁড়ো, হরিশপুর, চাঁদুল, জয়ন্তী, নারিকেলবেড়িয়া, নিজবালিয়া, বরুইপুর, খালনা প্রভৃতি গ্রামে অবস্থিত। চাঁদুল গ্রামের শিখর মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সেখানে গণ্ডী অংশটি খাঁজকাটা বেষ্টনীযুক্ত, যা বীরভূম-বাঁকুড়া জেলার শিখর দেউলের অনুরূপ। অন্যদিকে নারিকেলবেড়িয়া, নিজবালিয়া ও বরুইপুরের শিখর মন্দির তিনটির গর্ভগৃহ প্রথাগত বর্গক্ষেত্র না হয়ে আটকোণা, কিন্তু বাইরের দেওয়াল চতুষ্কোণ।

বাংলা মন্দির শৈলীর আর এক রূপ দালান রীতির মন্দির। সামনে ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দাসমেত সমতল ছাদের এ দেবালয়গুলির কোনটিতে উৎকৃষ্ট টেরাকোটা ও পঙ্খ সজ্জার প্রয়োগ দেখা যায়। এ শ্রেণীর দৃষ্টান্তের দেখা মেলে খালনা, কল্যাণপুর, কানুপাট ও দেবীপুরে। অন্যদিকে দোতলা দালান মন্দিরও এ জেলায় যে সমাদৃত হয়েছিল, তার উদাহরণ হল, কল্যাণচক, গাজীপুর, জয়পুর, জোকা, রাউতাড়া প্রভৃতি স্থানের দেবালয়।

এ জেলার বিভিন্ন মন্দিরের বাইরের সজ্জায় যেসব পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলির বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার ও রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্যসহ নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনী। সেকালের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সে সময়ের ফিরিঙ্গীদের জীবন চিত্র ও ধনী ভূস্বামীদের বিলাসবহুল জীবনের চিত্র প্রভৃতি এইসব পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলকে স্থান পেয়েছে। এছাড়া, মন্দির সজ্জায় পঙ্খের অলঙ্করণও ব্যবহৃত হয়েছে বহুল পরিমাণে।

এ জেলায় মসজিদ, দরগা বা মাজার, সংখ্যায় অল্প হলেও সেগুলি বেশ প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় সতের শতক ও পরবর্তীকালের কয়েকটি মসজিদ এখনও দেখা যায়, চেঙ্গাইল, শিবগঞ্জ ও জগৎবল্লভপুর গ্রামে। এছাড়া, এ জেলার আরও অন্যান্য স্থানে যে সব উল্লেখযোগ্য

মসজিদ দেখা যায় সে স্থানগুলি হল, চাঁদুল, ঝিংরা, বাঁকুল, কাজিপাড়া ও শালিখা। রাউতাড়া গ্রামের মানিকপীরের দোচালা-রীতির দরগাটি আকারে ছোট হলেও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বাণীবন গ্রামের জঙ্গলবিলাস পীরের চারচালা স্থাপত্যযুক্ত মাজারটিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ জেলার প্রথম গির্জাটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কুলেন প্লেসে মিশনারী মিঃ স্ট্যাথাম কর্তৃক নির্মিত হয়। হাওড়ায় রেল লাইন বসানোর ফলে স্থান সঙ্কুলানের জন্য ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সে গির্জাটিকে তৎকালীন ডবসনস্ লেন ও কিংস লেনের সংযোগস্থলে স্থানান্তরিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গথিক'-স্থাপত্যের এক নতুন উপাসানালয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার শিক্ষণের জন্য শিবপুরের বিশপস্ কলেজ প্রাঙ্গণে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গথিক'-রীতির সেন্ট টমাস গির্জা। অতঃপর তখনকার কুলেন প্লেসে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'আয়োনিক' শৈলীর রোমান ক্যাথলিক গির্জাটি নির্মিত হয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় কেন্দ্রীভূত ব্রাহ্মধর্ম এ জেলার হাওড়া, ব্যাঁটরা, বাগনান, উলুবেড়িয়া, আমতা প্রভৃতি থানা এলাকায় প্রসারলাভ করে। আমতা থানায় এ ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তক ফকিরদাস রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অমরাগাড়ি গ্রামে যে নববিধান ব্রাহ্ম উপাসনালয়টি স্থাপিত হয় সেটির সঙ্গে কলকাতার কেশব সেন স্ট্রীটের ব্রাহ্ম মন্দিরের স্থাপত্যগত সাদৃশ্য রয়েছে।

গ. কাঠের ভাস্কর্য সম্ভার

এ জেলায় কাঠখোদাই শিল্পের ঐতিহ্যটি একেবারেই অকিঞ্চিৎকর নয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, এ জেলায় দারু ভাস্কর্যের প্রবহমান ধারাটি খ্রীষ্টীয় আঠার শতক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর প্রমাণ হিসাবে এ জেলার বিভিন্ন স্থানে পূজিত দেব-বিগ্রহ, কাঠের রথ, চণ্ডীমণ্ডপ এবং মন্দির ও বসতবাড়ির দরজা প্রভৃতির অলংকরণ ও ভাস্কর্যের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

সাবেকি চণ্ডীমণ্ডপ এ জেলায় যা নির্মিত হয়েছিল তার অধিকাংশই বিনষ্ট। তবু ক্ষয়ক্ষতির হাত এড়িয়ে এমন দু'চারটি চণ্ডীমণ্ডপ যা টিকে আছে তার মধ্যে নাম করা যেতে পারে হরিহরপুর (থানা ঃ বাগনান) ও গয়েশপুর গ্রামের (থানা ঃ ডোমজুড়)) চণ্ডীমণ্ডপের নাম। উল্লেখ্য যে, এই দুটি চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটি ও আড়ায় বেশ কিছু কাঠ খোদাইয়ের নিদর্শন দেখা যেতে পারে।

এ জেলায় একদা প্রতিষ্ঠিত বহু উৎকৃষ্ট কাঠের কাজযুক্ত রথ নষ্ট হয়ে গেলেও বর্তমানে কাঠখোদাইযুক্ত অবশিষ্ট রথগুলি হ'ল রাউতাড়া ও ঝিখিরা (থানা ঃ আমতা), নিমাবালিয়া ও নিজবালিয়া (থানা ঃ জগৎবল্লভপুর), দেউলপুর (থানা ঃ পাঁচলা), বাগনান (থানা ঃ বাগনান) এবং চিলেয়াড়া ও কালীদহের (থানা ঃ শ্যামপুর) রথ। পলিয়াড়া গ্রামের (থানা ঃ উদয়নারায়ণপুর) সাবেক রথটি বিনষ্ট হয়ে গেলে সে রথের কাঠের পুতুলগুলি বর্তমানে হুগলী জেলার রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালায় সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। মাহিয়াড়ীর (থানা ঃ ডোমজুড়) কুণ্ডু চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত কাঠের রথটি বিনষ্ট হয়ে গেলেও সে রথ ও রথসজ্জার আনুষঙ্গিক মূর্তিগুলির আলোকচিত্র দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বৃহৎবঙ্গ' পুস্তকের ১ম খণ্ডে দেখা যেতে পারে।

এ জেলার নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব মঠ ও মন্দিরে উপাসিত বিগ্রহের অধিকাংশই হল কাঠের তৈরি গৌর-নিতাই মূর্তি। বৈষ্ণব দেবতার কাঠের মূর্তি দেখা যায় গড়বালিয়া (থানা ঃ জগৎবল্লভপুর), কালীদহ (থানা ঃ শ্যামপুর), কানুপাট (থানা ঃ উদয়নারায়ণপুর), আন্টিলা ও নজরপুর (থানা ঃ বাগনান) এবং মাদারিয়া (থানা ঃ আমতা) প্রভৃতি গ্রামে।

জেলার কাঠের শাক্ত মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লে, নিজবালিয়া (থানা ঃ জগৎবল্লভপুর) ও দেউলপুর গ্রামের (থানা ঃ পাঁচলা) সিংহবাহিনীর মূর্তি এবং নাইকুলি গ্রামের (থানা ঃ জগৎবল্লভপুর) বিশালাক্ষী মূর্তি। এছাড়া, এ জেলায় কাঠের কালীমূর্তি দেখা যেতে পারে কলিকাতা ও অমরাগাড়ি (থানা ঃ আমতা), খালোড় ও বাঙ্গালপুর (থানা ঃ বাগনান), গদাধরপুর, কোড়োলা ও জয়নগর মঠ (থানা ঃ পাঁচলা) প্রভৃতি স্থানে। কাঠের জয়চণ্ডী ও গড়চণ্ডীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে ঝিখিরা গ্রামে এবং গড়চণ্ডীর মূর্তি রসপুর গ্রামে (থানা ঃ আমতা)।

লৌকিক দেবী শীতলা ও মনসার কাঠের মূর্তি দেখা যায়, মাখালপুর (থানা ঃ আমতা) ও পুরুলপাড়ায় (থানা ঃ শ্যামপুর)। কেবলমাত্র কাঠের শীতলামূর্তির অবস্থান হল রসপুর (থানা ঃ আমতা), সুলতানপুর (থানা ঃ শ্যামপুর), দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ (থানা ঃ ডোমজুড়) এবং বাঁশতলা (হাওড়া শহর) প্রভৃতি স্থানে। কেবলমাত্র মনসার একটি দারুমূর্তি দেখা যায় নাইকুলি গ্রামে (থানা ঃ জগৎবল্লভপুর)। অন্যদিকে নিমাবালিয়া (থানা ঃ জগৎবল্লভপুর) গ্রামের হরপার্বতীর মূর্তিটি বর্তমানে ক্ষয়িত হলেও সেটির অনুপম ভাস্কর্য এ জেলার দারু শিল্পের ঐতিহ্যবাহী।

বাঙ্গালী শিল্পী-স্থপতিরা শুধুমাত্র মন্দিরের বহিরঙ্গ সজ্জায় নানাবিধ নকশাযুক্ত পোড়ামাটির ফলকই ব্যবহার করেননি, তাঁরা মন্দিরের কাঠের দরজার পাল্লাতেও বিভিন্ন নকশা ও মূর্তিও খোদাই করে দিতেন। অনেক সময় দেখা যায়, মাটির দেওয়াল দিয়ে নির্মিত মন্দিরেও এই ধরনের নকশাযুক্ত কপাট লাগানো হয়েছে। বস্তুতঃ এই ধরনের কাঠের ভাস্কর্য সমন্বিত দরজা নির্মাণে জেলার শিল্পীদের দক্ষতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ জেলার মন্দির-দেবালয়ে ব্যবহৃত এই ধরনের নকাশি কাঠের কপাটের উদাহরণ দেখা যায়, জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত বরদাবাড় গ্রামের আদক ও ছাউলে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতার মন্দিরে। এছাড়া, ঐ থানার রাধাপুর গ্রামে সামন্ত পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধর জীউর আটচালা মন্দিরেও নিবদ্ধ হয়েছে কাঠ খোদাই অলংকরণযুক্ত দু'টি কাঠের কপাট।

মন্দির ছাড়া এ জেলার বসতবাড়িতেও এই ধরনের নকাশি অলংকরণযুক্ত কপাট দেখা যায়। জগৎবল্লভপুর থানার চোংঘুরালি গ্রামে সরকার পরিবারের কাছারীবাড়ি এবং শ্যামপুর থানায় বিভিন্ন গ্রামের বসতবাড়িতে-এই ধরনের বিভিন্ন মূর্তি-ভাস্কর্য সমন্বিত বেশ কিছু কপাট দেখা যায়।

কাঠের নকাশি কপাট ছাড়াও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিবেদিত বৃষকাঠ স্তম্ভের উপর খোদাই কাজেরও বেশ কিছু নিদর্শন এ জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। আমতা, জগৎবল্লভপুর ও শ্যামপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে এই জাতীয় দারু-ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখা যায়। সেদিক থেকে এ জেলায় কাঠখোদাই কাজের ধারাবাহিকতা যে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত

হয়ে এসেছে, উল্লিখিত কাঠের কারুকাজের নিদর্শনগুলিই তার জ্বাজল্য প্রমাণ।

ঘ. শিক্ষা ও জনশিক্ষা : প্রাচীন হিন্দু রাজত্বে বর্তমান হাওড়া জেলার শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। পরবর্তী তুর্কী-আফগান রাজত্বকালে এ বিষয়ে তেমন কিছু জানা না গেলেও মোগল আমলের শেষ পর্যায়ে এ জেলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়।

বাংলায় যেসব কিংবদন্তী ও অতিকথা প্রচলিত ছিল তা থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে হাওড়ার উত্তরাঞ্চলে ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরিশ্রেষ্ঠি, অর্থাৎ চলতি কথায় ভুরশুট নামে এক রাজ্য ছিল, যার অস্তিত্ব ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের আরম্ভকাল পর্যন্ত। তাছাড়া আইন-ই-আকবরীতে যে পরগণা ভুরশুটের কথা উল্লিখিত হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত ছিল মোগল রাজত্বে সরকার সুলেমানাবাদের অধীন এবং সেটির এলাকা ছিল বর্তমান উদয়নারায়ণপুর ও আমতা থানা সহ হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়ার বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। আলোচ্য এই এলাকার মধ্যে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত ডিহি ভুরশুট এবং হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়ার অন্তর্গত পার ভুরশুট গ্রাম দুটি সেই স্মৃতিবহ হয়ে আছে।

খ্রীষ্টীয় দশম শতকে ন্যায়কন্দলী গ্রন্থের রচয়িতা বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীধরাচার্য ভূরিশ্রেষ্ঠে বসবাস করতেন এবং তার চতুষ্পাটিতে দর্শনশাস্ত্রের 'সর্বতত্ত্ব' বিষয়টিও ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায় যে, ভূরিশ্রেষ্ঠি সে সময়ে ছিল দক্ষিণ রাঢ়ের একটি অংশ এবং পাণ্ডুদাস নামে কোন এক কায়স্থ রাজার অধীন ছিল ঐ ভূরিশ্রেষ্ঠি, যিনি ছিলেন শ্রীধরাচার্যের একজন পৃষ্ঠপোষক। শ্রীধরাচার্যের পিতামহ বৃহস্পতির সময় থেকে শ্রীধরাচার্যের সময়কাল খ্রীষ্টীয নবম শতক পর্যন্ত ভূরশিট বিদ্যাচর্চার একটি বড় কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।

পববর্তীকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে জনৈক মুখোটি ব্রাহ্মণ চতুরানন মহানেউকী তার বসতি গড়ভবানীপুর থেকে গোটা ভুরশুট পরগণা শাসন করতেন বলে জানা যায়। এই পরিবারের গোষ্ঠিপতি জনৈক কৃষ্ণ রায় ছিলেন আকবর বাদশাহের সমসাময়িক। পরবর্তী ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকালে এই বংশের প্রতাপনারায়ণ ভুরশুট পরগণার সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার একজন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁরই সভাসদ বৈদ্যবংশীয় জনৈক ভরতমল্লিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রন্থ 'চন্দ্রপ্রভা' (আঃ খ্রীঃ ১৬৭৬) ও 'রত্নপ্রভা' (আঃ খ্রীঃ ১৬৮০) গ্রন্থ দুটি রচনা করেছিলেন।

উল্লিখিত প্রতাপনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ এবং তাঁর পুত্র হলেন নরনারায়ণ। এই নরনারায়ণের আমলেই ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র ভুরশুট পরগণা আক্রমণ করে নিজ দখলে আনেন। শেষ অবধি বর্ধমানরাজ চিত্রসেন, নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে বেশ কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করলেও লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্রেরা গড়ভবানীপুর ছেড়ে পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে বসবাস করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সে সময় ভুরশুটে তিনটি গড় ছিল। তার মধ্যে প্রধান গড়টি ছিল গড়ভবানীপুরে, দ্বিতীয় গড়টি এই রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখা কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে এবং ভুরশুটের তৃতীয় গড়টির অবস্থান ছিল দোগাছিয়ায়, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃষ্ণ রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায়। পেঁড়োর গড়ে অধিষ্ঠিত রাজবংশের শাখাতেই নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হয়। বাল্যকালে হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে নিজ গ্রামে ফিরে এলেও বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের রাজরোষে পড়ে গ্রেপ্তার হন। পরে তিনি বন্দীশালা থেকে পালিয়ে ওড়িশা চলে গেলেও আবার তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। আর্থিক অনটনের কারণে তদানীন্তন ফরাসী শাসনকর্তার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সাহায্যপ্রার্থী হলে তাঁর আনুকূল্যে তিনি নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের কাছে আশ্রয়লাভ করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার কাব্যগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর রাজসভার সভাকবি নিযুক্ত করেন এবং মূলাজোড়ে নিষ্কর ভূমিও প্রদান করেন। সেখানেই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আটচল্লিশ বছর বয়সে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্রের প্রথম রচনার মধ্যে দেখা যায় দুটি পাঁচালী কাব্য, যা সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল 'অন্নদামঙ্গল'।

ভুরশুট পরগণার কবি ভারতচন্দ্রের মত সমসাময়িক পার্শ্ববর্তী বালিয়া পরগণার হাফেজপুর গ্রামের আর এক বিখ্যাত কবি হলেন শাহ সৈয়দ গরীবুল্লা। তাঁর রচিত কাব্যকাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আমীর হামজা, ইউসুফ জুলেখা, সোনাভান ও জঙ্গনামা কাব্য।

এই সময় উনিশ শতকে ভুরশুট পরগণার অধীন উদানা বা অদুনা গ্রামের আর এক মুসলিম কবি সৈয়দ হামজা রচনা করেন মনোহর মধুমালতী, আমীর হামজা, জৈগুনের পুঁথি ও হাতেমতাই প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। এই শতকের আর এক কবি হলেন সেখ হটু, যিনি সত্যপীর পাঁচালীর রচয়িতা।

আমতা থানার এলাকাধীন রসপুর গ্রামও ছিল বিদ্যাচর্চার এক বিখ্যাত কেন্দ্র। এই গ্রামের কায়স্থ রায় পরিবারের কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় খ্রীষ্টীয় সতের শতকের মধ্যভাগে 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন। শাঁকরাইল থানার অন্তর্গত জোড়হাট গ্রামের কবি দ্বিজ হরিদেব খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের প্রথম দিকে রচনা করেন দক্ষিণ রায় মাহাত্ম্য নিয়ে রায়-মঙ্গল এবং শীতলামঙ্গল কাব্য।

খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের আর এক কবি হলেন খুরুটের দ্বিজ রঘুনন্দন, যিনি পঞ্চানন্দ মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। অনুরূপ যাদব পণ্ডিত বা যাদুনাথ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে যে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন ডোমজুড়ের বাসিন্দা।

লক্ষ্মীর পাঁচালী বা ব্রতকথা নিয়ে কাব্য রচনায় এ জেলায় যে দুজন কবির খোঁজ পাওয়া যায়, তার মধ্যে একজন হলেন ১৭৩০ সালে শিবপুর থানার অধীন পাঁচপাড়া গ্রামের কবি প্রাণবল্লভ এবং অন্যজন হলেন শ্যামপুর থানার অধীন আমবেড়্যা গ্রামের আঠার শতকের কবি শ্রীগোবিন্দরাম। এছাড়া সমসাময়িক আমতা থানার অন্তর্গত জন্তী গ্রামের জনৈক কবি কিংকর সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছিলেন।

সেকালে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও বিদ্যাচর্চার আর এক বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল বালী ও বেলুড়। বালীর ভট্টাচার্য পরিবারের বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাঘা প্রগলভ ভট্টাচার্য ছিলেন বালী

বিদ্যাসমাজের গুরু। এছাড়া, এখানের চৈতল চট্ট পরিবারের এক বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার। বালীর ঘোষাল পরিবারের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন রামশঙ্কর তর্কপঞ্চানন, যার চতুস্পাটি বালীর বর্গীডাঙ্গায় স্থাপিত ছিল।

বালীর মত বেলুড় ও তার আশপাশে খ্রীষ্টীয় সতের শতক থেকে বহু টোল ও চতুস্পাটির অস্তিত্ব ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এখানের দুর্গাপ্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশ ও কৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্যাসাগর ছিলেন বেলুড়ের পণ্ডিত গুরু। রামজয় ভট্টাচার্য শিরোমণি বালীতে যে চতুস্পাটি স্থাপন করেন সেখানকার ছাত্র ছিলেন উল্লিখিত দুর্গাপ্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশ।

অন্যদিকে আমতা থানার প্রায় তিনশো বছরের ঐতিহ্যবাহী নারিট গ্রামও ছিল সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার এক প্রধান কেন্দ্র। এ গ্রামেও ছিল বহু সংস্কৃত টোল ও চতুস্পাটি। এখানকার প্রাচীন চতুস্পাটির স্থাপনকর্তা পণ্ডিত গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ছিলেন ন্যায়, দর্শন ও অলংকারশাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিত এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করেছিলেন।

শাঁকরাইল থানার অন্তর্গত আঁদুল গ্রামও ছিল সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার এক কেন্দ্র। একানকার তান্ত্রিক সাধক ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগরের বিদ্যাবত্তার প্রশংসায় আঁদুলকে বলা হত 'দক্ষিণের নবদ্বীপ।' আঁদুলের মতই সংস্কৃত চতুস্পাটি হিসাবে বিখ্যাত ছিল পাতিহাল (থানা ঃ জগৎবল্লভপুর), মাকড়দহ (থানা ঃ ডোমজুড়) এবং বালিটিকুরি (থানা ঃ জাগাছা) প্রভৃতি গ্রাম। এছাড়া হাওড়া শহর, সাঁতরাগাছি, শালকিয়া বাবুডাঙ্গা ও বামুনগাছি এলাকাতেও সংস্কৃত শিক্ষার বেশ কিছু টোল স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষার পূর্বতন ঐতিহ্য বহুলাংশে অস্তমিত।

হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকার বসন্তপুর গ্রামের এবং রামপুর গ্রামের দুটি চতুস্পাটি প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। বিভিন্ন বিষয়ক সংস্কৃত শিক্ষার তুলট কাগজ ও তালপাতায় লেখা পুঁথি জেলার ডিভুরশুট, পেঁড়ো-হরিশপুর .ড়ভবানীপুর, দোগাছিয়া প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বাড়িতে এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। জেলার বাগনান থানার কল্যাণপুর গ্রামে পণ্ডিত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ শুদ্ধাচারে মুদ্রণের জন্য তালপাতার উপর হ্যাণ্ডপ্রেসে ছেপে প্রকাশ করা হয়।

এ জেলায় মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপনের আদি বৃত্তান্ত জানা না গেলেও ভুরশুট ও বালিয়া পরগণার নানাস্থানে এবং শাঁকরাইল থানায় টিকা পীর-এর মসজিদের কাছে বেশ কয়েকটি মক্তব ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া, উলুবেড়িয়া থানার বানীবন গ্রামে জঙ্গলবিলাস পীর থানের কাছে ছিল একটি মক্তব।

হাওড়ায় আধুনিক পশ্চিমি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ণে সেসময়ের লেভেট সাহেবের বাগানবাড়ি, অর্থাৎ বর্তমান কালেক্টরীর অফিস এলাকায় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয় বেঙ্গল মিলিটারী অরফ্যান এ্যাসাইলাম। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মৃত সৈনিক পুত্রদের যথাযথ শিক্ষাদান। পাঁচশত ছেলেমেয়ে এখানে শিক্ষালাভ করতো।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি দেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দুটি পৃথক স্কুল খোলেন। পরে অখ্রীষ্টান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের

জন্য বাংলা মাধ্যমে উপদেশপ্রদ প্রথায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দুটি প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। হাওড়ায় স্থাপিত ব্যাপটিষ্ট মিশনারীর প্রথম পাদরী মিঃ স্টাথাম ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া শহরে যে বোর্ডিং স্কুলটি স্থাপন করেন সেটি অবশ্য বছর ছয়েক বাদে বন্ধ হয়ে যায়। খ্রীষ্টান মিশনারীরা শিবপুরে ১৮২৪ সালে এবং ১৮২৭ সালে ব্যাঁটরায় দুটি বাংলা স্কুল স্থাপন করে। এছাড়া, অন্য এক ব্যাপটিষ্ট মিশনারী মরগ্যান সাহেব সম্ভবতঃ ঘুসুড়িতে যে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন, সেটি ষোল বছর পরে বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, মিশনারীদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি ছিল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি ছাত্রদের জন্য। তবে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত মিশনারীদের পরিচালিত হাওড়া শহরের সেন্ট টমাস স্কুলটি আজও বজায় রয়েছে।

ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ সালে আঁদুলের ভূস্বামী রাজনারায়ণের সহায়তায় আঁদুলে স্থাপিত হয় 'আন্দুল আকাডেমি'। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া ময়দানের কাছাকাছি এক স্থানে সে সময়েব জেলা শাসকের উদ্যোগে যে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়, সেটি পরবর্তী সময়ে হাওড়া ময়দানের সংলগ্ন আড়াই বিঘা জমির উপর উঠে আসে, যা আজকের হাওড়া জেলা স্কুল। এরপর হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জগৎবল্লভপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। পরবর্তী ১৮৫৪ সালে বাগনানে স্থাপিত হয় বাগনান উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। পরবৎসর ১৮৫৫ সালে হাওড়া কোর্টের ব্যবহারজীবী ক্ষেত্রমোহন মিত্র-র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় শালকিয়া অ্যাংলো ভার্ণিকুলার স্কুল, যা বর্তমানে শালকিয়া অ্যাংলো স্যানস্ক্রিট নামে খ্যাত। অন্যদিকে আলোচ্য এই বৎসরেই খ্রীষ্টান মিশনারী ও স্থানীয় উৎসাহীদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় বেলুড় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং ১৮৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সেদিনের বালীর রিভার্স টমসন বিদ্যালয়টি আজকের বালী শান্তিরাম বিদ্যালয়। পরবর্তী ১৮৫৭ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বলুটিতে স্থাপিত হয় বলুটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং ঐ বৎসরেই আমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় আমতা পিতাম্বর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং সাঁতরাগাছিতে স্থাপিত সেদিনের সে বিদ্যালয়টি বর্তমানে কেদারনাথ ইন্সটিটিউসনে রূপান্তরিত।

পরিশেষে উনিশ শতকে হাওড়ায় স্থাপিত উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলি ছাড়া অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়গুলির তালিকা ও বন্ধনী মধ্যে প্রতিষ্ঠা তারিখ নিম্নরূপ ঃ মাহিয়াড়ী কুণ্ডু চৌধুরী ইন্সটিটিউসন (১৮৪২), নারিট ন্যায়রত্ন ইন্সটিটিউশন(১৮৬৪), উলুবেড়িয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৬৬), মুগকল্যাণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৬৬), গড়ভবানীপুর রামপ্রসন্ন ইন্সটিটিউশন (১৮৬৭), শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (১৮৭৪), রসপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৭৬), বি. কে. পাল ইন্সটিটিউশন (১৮৭৭), রসপুর বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৮), খসমোরা হাইস্কুল (১৮৮০), দেউলগ্রাম-মানকুর-বাকসী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৮০), জয়পুর ফকিরদাস ইন্সটিটিউশন (১৮৮০), মাজু আর. এন. বসু উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৮৩), পানপুর শশীভূষণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৮৫), রিপন কলেজিয়েট স্কুল (১৮৮৬), কটন ইনস্টিটিউশন (১৮৮৬), রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ইন্সটিটিউশন (১৮৮৭), বালী গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল (১৮৮৭), ঝিখিরা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৮৯), পানিত্রাস

উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৯০), টাউন স্কুল, হাওড়া (১৮৯০), হাওড়া আই আর বেলিলিয়াস ইন্সটিটিউসন (১৮৯১), পাঁচলা আজিম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮৯৪), শালকিয়া হিন্দু স্কুল (১৮৯৯)। বর্তমানে এ জেলায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ২৭২৯টি। তার মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৮১; উচ্চ মাধমিক বিদ্যালয় ৮০ এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫৭টি। এছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২১১টি।

উনিশ শতকে হাওড়া জেলায় শহর ও গ্রামে বিদ্যলয় স্থাপনের এই ধারাবাহিকতার মধ্যে যা বিশেষ লক্ষণীয় তা হল, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। আলোচ্য এই শতকে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, শিবপুর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (১৮৬৭), রসপুর গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল (১৮৭৬), বালী গার্লস স্কুল (১৮৮৭) এবং মুগকল্যাণ উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় (১৮৯৮), বানীবন গার্লস হাই স্কুল(১৮৯৮) প্রভৃতি।

বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে হাওড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও কম গৌরবজনক নয়। উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য বিশপ্‌স মিডলটনের উদ্যোগে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশপস্ কলেজ। পরে এই কলেজটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে, ১৮৮০ সালে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে এখানেই উঠে আসে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত হাওড়ায় প্রথম কলেজ নরসিংহ দত্ত কলেজ, যেটি সে সময়ের বেলিলিয়াস সাহেবের বাগানবাড়িতে স্থাপিত হয় ১৯২৩ সালে। পরবর্তী ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির এবং ১৯৪৬ সালে রামসদয় কলেজ (আমতা) ও হাওড়া গার্লস কলেজ। শেষোক্ত কলেজটির বর্তমান নামকরণ হয়েছে বিজয়কৃষ্ণ কলেজ। স্বাধীনোত্তর কালে প্রতিষ্ঠিত হয় শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ (১৯৪৮), উলুবেড়িয়া কলেজ (১৯৪৮-৪৯), বাগনান কলেজ (১৯৫৮), শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয় (১৯৬৪), আন্দুল প্রভু জগবন্ধু কলেজ (১৯৬৪), লালবাবা কলেজ (১৯৬৪), পুরাশ কানপুর কলেজ (১৯৬৬), কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ (১৯৮০), আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি কলেজ (১৯৮৬) ও পঞ্চানন রায় জয়পুর কলেজ (১৯৮৬)।

জেলায় শিক্ষিত মানুষজনের সংখ্যা (১৯৯১) ২১৪৩৩০৬ জন এবং এর মধ্যে পুরুষ ১২৯১৬২০ ও নারী ৮৫১৬৮৬ জন। জেলার সাক্ষরতার হার শতকরা ৭২ ভাগ এবং সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মতই এ জেলার শহর ও গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তারই ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, জেলার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে ১৮৮৪ সালে। পরবর্তী বৎসরে ১৮৮৫ সালে স্থাপিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারটি হল ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী এবং ঐ বৎসরই প্রতিষ্ঠিত হয় বালী সাধারণ গ্রন্থাগার। উল্লেখ্য যে, বালীর গোস্বামী ও পাঠকপাড়ায় যে দুটি গ্রন্থাগার ছিল সে দুটিকে ১৮৮৩ সাল নাগাদ একত্রীকরণ করে বালী সাধারণ গ্রন্থাগার হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং ১৯২৪ সালে ১৭৬, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডস্থ বর্তমান ভবনে স্থানান্তরণ করা হয়। পরবর্তী ১৮৮৬ সালে স্থাপিত হয় মাহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী।

এছাড়া, জেলার অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি হল, মাকড়দহ সারস্বত লাইব্রেরী

(১৮৮৫), হাওড়ার ১০৬, নেতাজী সুভাষ রোডে অবস্থিত ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন লাইব্রেরী (১৮৮৯), রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরী (১৮৮৯), হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব লাইব্রেরী (১৮৮৯), বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৯৫), রামকৃষ্ণপুর সংসদ লাইব্রেরী (১৯০০), মাজু পাবলিক লাইব্রেরী (১৯০২), শালিখার গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্যসমাজ গ্রন্থাগার (১৯১২), হাওড়ার ডিউক লাইব্রেরী (১৯১৪),সাঁতরাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী (১৯১৬), মাধব মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, শালিখা (১৯১৭) রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী (১৯১৯), বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার, শালিখা (১৯৩৪)এবং হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসন ও জেলা সেন্ট্রাল লাইব্রেরী (১৯৫৫) প্রভৃতি। বর্তমানে এ জেলায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ১৩৫ এবং বেসরকারী গ্রন্থাগার ১২৫, মোট ২৬০ গ্রন্থাগার বর্তমান রয়েছে।

জেলায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মত, মিউজিয়ম সংক্রান্ত যে সংগঠনগুলি বর্তমান, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল, শিবপুরের ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ভারতের সর্ববৃহৎ এই উদ্ভিদ উদ্যানটির উদ্যোক্তা ও স্থাপয়িতা ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমর সচিব কর্ণেল রবার্ট কিড। ২৭১ একর স্থান জুড়ে বিস্তৃত এই উদ্ভিদ উদ্যানটিতে রোপিত হয়েছে দেশী বিদেশী গাছপালা। উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এখানে একটি গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারও আছে।

জেলায় প্রত্নতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আর একটি মিউজিয়ম হল, বাগনানের নিকটবর্তী আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালা। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে, পাথরের প্রাচীন মূর্তি-ভাস্কর্য, পোড়ামাটির মূর্তিকা ও পাত্র, মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলক এবং বাংলার নানাবিধ পুতুল, খেলনা, পট, কাঁথা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান।

এছাড়া বাগনানের অদূরে অবস্থিত পাণিত্রাস গ্রামে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগার কক্ষে স্থাপিত শরৎস্মৃতি সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হয়েছে, শরৎচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপি এবং সেইসঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রভৃতি।

৬. পত্র-পত্রিকা : উনিশ শতকের মধ্যভাগে এ জেলায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের যে সূচনা ঘটেছিল আজও তার জের হিসাবে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা এ জেলা থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। হাওড়া জেলায় ১৮৪৮ সালে শিবপুর থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদ মুক্তাবলী। হাওড়ার প্রথম মাসিক পত্রিকা 'শুভকরী' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বালী থেকে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১৮৬৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ১৮৮৬-তে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সংগঠকরা উলুবেড়িয়া থেকে প্রকাশ করেন 'গ্রামবাসী' নামে এক পত্রিকা। পরে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'উলুবেড়িয়া দর্পণ'। বাগনানের নিকটবর্তী কল্যাণপুর গ্রাম থেকে ১৯১৯ সালে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' নামে একটি ধর্মমূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মাহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হত 'পাঞ্চজন্য' নামে একটি পত্রিকা, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্ম, কৃষি, সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্র সংবাদ প্রভৃতি বিষয়। পঞ্চমুখী এক শাঁখের নীচে থাকতো পত্রিকার নামপত্র 'পাঞ্চজন্য'

এবং তার নীচে থাকতো দুই পংক্তির সংস্কৃত শ্লোক ঃ 'ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণু না বিধৃতঃ। / নমিতঃ সর্ব্বদেবেশ্চ পাঞ্চজন্য নমোহস্তুতে।।' বাগনানের নিকটবর্তী খাদিনান গ্রাম থেকে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হত 'পল্লীবাণী' পত্রিকা।

পরবর্তী ১৯৪০-৪১ সালে উলুবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত হত 'প্রাচ্য' নামে একটি পত্রিকা। তদানীন্তন হাওড়া পৌরসভা তার মুখপত্র হিসাবে ১৯৪৮ সালে প্রকাশ করে দ্বিভাষিক পত্রিকা 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট'। অনুরূপ ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রকাশিত হয় বালী পৌরসভার মুখপত্র 'বালী পৌরবার্তা'। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণপুর লেন থেকে প্রকাশ করা হয় 'নব্যভারত' পত্রিকা এবং সালেই বাগনানের অন্তর্গত নবাসন গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় কিশোরদের উপযোগী 'পথের আলো' পত্রিকা।

১৯৫১ সালে উলুবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'উলুবেড়িয়া সংবাদ' এবং ১৯৫৬ সালে ফুলেশ্বর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সন্দেশ' পত্রিকা এবং ঐ সময়েই উলুবেড়িয়া থেকে প্রকাশ করা হয় পাক্ষিক 'দেশসেবক' পত্রিকা।

পরবর্তী পর্যায়ে হাওড়ার সালকিয়া থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'হাওড়া বার্তা', কদমতলা থেকে 'দেশহিতৈষী', হেম চক্রবর্তী লেন থেকে 'বিচার' প্রভৃতি। বর্তমানে বাগনান থেকে 'বাগনান বার্তা' পত্রিকা', মাজু থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'অনেক আকাশ', যদুরবেড়িয়া থেকে দ্বিমাসিক 'বনানী', হাওড়া থেকে ত্রৈমাসিক 'আশাবরী' এবং বাগনান থেকে পাক্ষিক 'আলেয়া' পত্রিকা ও নবাসন থেকে 'কৌশিকী' পত্রিকা। সরকারী হিসেব অনুযায়ী হাওড়া থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় পনেরটি, তারমধ্যে একটি হিন্দি ও অন্যগুলি বাংলা।

চ. জেলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত ঃ এ জেলায় লোকসঙ্গীতেরও এক ঐতিহ্য বিদ্যমান। জেলার নানান লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সব লোকসঙ্গীত গীত হয়ে থাকে তার মধ্যে নানান বৈশিষ্ট্যও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। নগরায়নের ফলে এ জেলার লোকসঙ্গীতের ধারাটি আজ ক্ষীণতম পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও এখনও জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে নানা বিষয়ভিত্তিক লোকসঙ্গীত।

এ জেলায় লোকদেবতা শিবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হ'ল গাজন উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দলগতভাবে অনুষ্ঠিত হয় সঙের গান এবং বহুক্ষেত্রে এই সঙের গান নিয়ে প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এই সময় শিবমন্দির প্রাঙ্গনে হয়ে থাকে কালকে-পাতারি বিষয়ক লোকনৃত্য।

চৈত্র মাসে হয় ঘেঁটু ঠাকুরের উৎসব। ঘেঁটু খোস-পাচড়া নিবারণের দেবতা, তাই তাকে পাল্কিতে চাপিয়ে গ্রামে গ্রামে নৃত্যগীত সহকারে ভ্রমণ করা হয়। এই উপলক্ষে গাওয়া ঘেঁটুর গানগুলি এ জেলার নিজস্ব এক লোকসঙ্গীত বলা যেতে পারে।

এ জেলায় কিছু সাপুড়ে মাল সম্প্রদায় আছেন, যারা 'গ্লাভস পাপেট' অর্থাৎ হাত-নাচনা পুতুল দেখিয়ে গান করে থাকেন। এছাড়া, এক সময়ে প্রশস্থ ও চণ্ডীপুরের চিত্রকর সম্প্রদায় পট এঁকে এবং সেগুলি দেখিয়ে আখ্যানমূলক গান গেয়ে বেড়াতেন, যা পটুয়া সঙ্গীত হিসাবে খ্যাত। তদপরি এখানকার পটুয়া ছেলেরা করতেন হাপু গান।

জেলার উত্তরাঞ্চলে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কৃষ্ণ বন্দনাসূচক বাউল সুরে 'বাদাই' গান

অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া, দেহতত্ত্ব ও পৌরাণিক কাহিনী বিষয়ক 'গোদাভারত' গান বিশেষ এক সুরে গাওয়া হয়, যা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

জেলায় মুসলমান ফকিরি গানেরও এক ঐতিহ্য বিদ্যমান। এছাড়া আছে, সুফী আনোয়ার শাহ দরুদ রচিত 'দরুদ গান'। ঢোল ও অন্যান্য যন্ত্র সহযোগে মুসলমান যুবকেরা সমবেতভাবে এই গানটি করে থাকেন। এছাড়া, এ জেলার মুসলিম নারী সমাজের গীত বিয়ের গানও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কবি ও তর্জা গানেরও এক ঐতিহ্য এ জেলায় বিদ্যমান ছিল। এ জেলার কবিগানের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন শালিখার রাম বসু (১৭৮৩ ১৮২৮)। এখনও এ জেলায় বিভিন্ন শিল্পীদলের কৃত তর্জা ও কবিগানের আসর বসে থাকে। সর্বোপরি, এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বহু প্রচলিত কীর্তনগান, ঝুমুর ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক লোকগান প্রভৃতি জেলার লোকসঙ্গীতের অবদানরূপে গণ্য হতে পারে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহ গীতিকা বা 'ব্যালাড'-এর আকারেই সর্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছিল এবং এই প্রাচীনতম রূপটি যে একদা লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত ছিল—এমন ধারণা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে এ জেলার মঙ্গলকাব্যের কবি ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল), রামকৃষ্ণ রায় (শিবায়ন), হরিদেব শর্মা (রায়মঙ্গল ও শীতলা মঙ্গল), কবি কিংকর (সত্যপীর), শেখ হটু (সত্যপীর), কবি সৈয়দ গরীবুল্লাহ (সত্যপীর, জঙ্গনামা, সোনাভান), সৈয়দ হামজা (মনোহর মধুমালতী), প্রাণবল্লভ (লক্ষ্মীর পাঁচালী), গোবিন্দরাম (লক্ষ্মীর ব্রতকথা) প্রভৃতি কবিদের অবদান যে অনেকাংশেই এই আঞ্চলিক লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের উপকরণ থেকে প্রভাবিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজও এই জেলার নানাস্থানে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠানে যে পাঁচালী, জাগরণ, ভাসান বা সয়লা গান (সই বা বন্ধু ও মিতে পাতানোর গান) হয়ে থাকে, তা যে বহুল প্রচলিত আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের শ্রোতধারায় পুষ্ট তা সহজেই অনুমান করা যায়। অন্যদিকে এইসব মঙ্গলগীত যারা করে থাকেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশ হলেন পেশাদার দল এবং সে দলগুলির একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য বর্তমান। সমাজের আর্থিক দৈন্যকে তুচ্ছ করে এরা এখনও বাংলার মাটির সম্পদ বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিকে নিয়ে জেলার গ্রামে গ্রামে অখ্যাত অবস্থায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন।

ছ. জেলার যাত্রা-নাটকের ঐতিহ্য : হাওড়া জেলার যাত্রা-নাটকেরও এক ঐতিহ্য ছিল। সভ্যতার উৎকর্ষের ফলে চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে হাওড়া জেলার কোন্ অঞ্চলে কবে কোথায় সর্বপ্রথম যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে এই জেলার বহু পেশাদার ও অপেশাদার দলই যে গোটা দেশ জুড়ে যাত্রা-নাটকের বাজার সরগরম করে তুলেছিলেন, তার কিছু কিছু উদাহরণ অবশ্য পাওয়া গেছে। আর সেই সঙ্গে সেকালের পটভূমিকায় হাওড়ার নাট্যামোদী সমাজের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত রচনা করতে যেয়ে বহু জ্ঞানী-গুণী, খ্যাত-অখ্যাত শিল্পী ও নাট্যকারের পরিচয় মিলেছে ; আর তার মধ্যে কত অজ্ঞাতই যে রয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

নাট্যমঞ্চের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু একশো বছর আগের গ্রাম-গ্রামান্তরের যাত্রা-নাটকের অবস্থা কি ছিল— তার বিবরণ যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা হল,

সাহিত্যিক বা প্রবন্ধকারের লেখনীতে বা স্মৃতিচিত্রের কথনে। একশো বছর আগে আমাদের দেশের নাটকাভিনয় বা পেশাদার দল সম্পর্কে কিছু জানতে গেলেই খুঁজে বেড়াতে হবে অতীতের জীর্ণপত্রে লেখা বিবরণের সন্ধানে। সেই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করে এই জেলার বিভিন্ন স্থানের বনেদী পরিবারে রক্ষিত প্রাচীন হিসাবপত্রে সেকালের পেশাদারী যাত্রাদল সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। এমনি ধরনের পুরানো এক হিসাবপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যায়, বিগত ১১৮০ বঙ্গাব্দের (১৭৭৪ খ্রীঃ) ৩০শে পৌষ আমতা থানার রসপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত এমনি এক যাত্রাপালায় যাত্রাদলের অধিকারী দয়ারাম সূত্রধরের যাত্রাগান শুনে রায়বাড়ীর কর্তামশায় তাকে 'শিরোপা' প্রদানে সম্মানিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই যাত্রাগানের জন্য সেই সময় ব্যয় করা হয়েছিল আঠার টাকা তিন পয়সা এবং সেই সঙ্গে রোশনাই তেলের খরচ পড়েছিল আট টাকা। তবে কতদিনের জন্য এই আঠার টাকা তিন পয়সা যাত্রাদল বাবত এবং কতটা পরিমাণ রোশনাই তেল বাবত এই ব্যয় নির্বাহ হয়েছিল, তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে এই যাত্রাপালা যে ক'দিনের জন্যই হোক না কেন, হিসাবদৃষ্টে আঠার টাকা তিন পয়সা খরচ খুবই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে রোশনাই তেল সম্পর্কে আমাদের একান্তই কৌতূহল হয় এই ভেবে যে, তখন ডে-লাইট, পাঞ্চলাইট বা পেট্রোম্যাক্স ওঠেনি। তাই দিনের আলোয় যাত্রা অনুষ্ঠান ছাড়াও রাত্রিতে ঝাড় লণ্ঠন, প্রদীপের আলো বা ছোট ছোট মশালের ব্যবস্থার জন্যই রোশনাই তেলের ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য জানা যায়নি, সে সময় রোশনাই তেলের আলোর ছটায় সাধারণ লোকের মেজাজকে কেমন খুশী রাখা যেত।

এছাড়া. আর একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া গেছে, শুধুমাত্র জমিদারী এক হিসেব-নিকাশের খাতায়। সে সময়ে বাগনানের ছোটখাটো জমিদার বাড়ির দুর্গোৎসবের হিসেবনিকাশের বিবরণে পেশাদারী যাত্রাদলের নাটকাভিনয়ের দরুণ ব্যয় নির্বাহের এক ফর্দ পাওয়া গেছে। প্রায় দু'শো বছর আগে (১২৬৯ বঙ্গাব্দ ১৮৬২ খ্রীঃ) মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে পেশাদার যাত্রাদল হিসাবে যারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, সে চিত্রটি আমাদের কাছে একান্তই কৌতূহলের। আগ্রহশীলদের অবগতির জন্য এই হিসেবের তালিকাটি হুবহু তুলে দেওয়া গেল এবং এই তালিকাটি বাগনানের গ্রামীণ সংগ্রহশালা আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালায় সংরক্ষিত।

হিসেবের খাতার বয়ানটি নিম্নরূপ ঃ

শ্রী শ্রী ৺শারদীয় পুজার যাত্রাওলা বিদাই ফুরণ ও চুক্তি —

সন ১২৬৯ সাল তারিখ হিঃ ১২ আশ্বিন নাঃ ১৭ রোজ

যাত্রাওলার অধিকারী

শ্রীগঙ্গারাম দাষ

সাং - মনোহরপুর

ফুরণ ৬ রাত্র চুক্তি

কোং	২৪্
ফির্রি ৫ রাত্র চুক্তি	২।।০
অধিকারীর বিদাই	।।০

দুতির বিদাই	।।০
বাএন দুই জোনার বিদাই	।।০
বেএলাদার বিদাই	।।০
ফিরি নগদ দেওয়া যায় নবমির রাত্র	৩।০
খোরাকী ৭ রোজ	৮টা. ২ আ.
বালকগণকে দেওয়া যায়	।০
	৪০।০

প্রায় দু'শো বছর আগে মনোহরপুরের যাত্রাদলের অধিকারী কোন এক গঙ্গারাম দাস চার টাকা রাত্রি হিসেবে মোট চব্বিশ টাকা ফুরণে যে কি যাত্রাগানের পালা গেয়েছিলেন তা আমরা জানিনে, কিন্তু খাতার পাতায় তার নাম, ঠিকানা এবং যাত্রাদলের অন্যান্য সহযোগীদের পারিশ্রমিকের বিবরণই আমাদের কাছে একান্ত কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার আসছি পেশাদার নাট্য সম্প্রদায় সম্পর্কে। পরবর্তীকালে পেশাদার নাট্য সম্প্রদায় হাওড়া জেলায় যে কটি গড়ে উঠেছিল তা আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেও, একদা পুর্বসূরী হিসাবে যে অবদান তাঁরা রেখে গেছেন, তা আজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য এবং এই সঙ্গে হাওড়া জেলাবাসী হিসেবে আমরা একান্তই গর্বিত।

আনুমানিক উনিশ শতকের প্রথমদিকে হাওড়ায় কবিগানের একজন বিখ্যাত কবিয়াল গায়ক হলেন শালকিয়ার রাম বসু। পরবর্তী আনুমানিক উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই জেলার একজন বিখ্যাত পালাকার হলেন ব্যাঁটরার ঠাকুরদাস দত্ত। তাঁর সংগঠিত যাত্রাদল এক সময়ে জনমানসে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ঠাকুরদাস দত্ত ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন অফিস-কেরানী। পরে চাকরী ছেড়ে তিনি ১৮৩১ সালে যাত্রাদল গঠন করেন এবং নিজেও অনেক পালা রচনা করেন। তাঁর দলে 'বিদ্যাসুন্দর', 'লক্ষ্ণণ বর্জন' ও 'রাবণ বধ' পালা খুবই বিখ্যাত ছিল।

হাওড়ার মাকড়দাতে বোকা ও তার ভাই সাধু — মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়েও এই সময় নিজেরা একটি পেশাদার যাত্রাদল খুলেছিলেন। সেকালে দলটির নাম ছিল 'বোকার যাত্রাদল'। এদের দলে ঠাকুরদাস দত্তের লবকুশ, বিদ্যাসুন্দর ও হরিশচন্দ্র নাটকও অভিনীত হতো। আলোচ্য এই মাকড়দাতে বেনীমাধব পাত্রও এই সময়ে একটি যাত্রাদল খুলেছিলেন। বরাহনগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'কৃষ্ণযাত্রা' ও 'চন্ডীযাত্রা'র পালা ছাড়া এদের দলে ঠাকুরদাস দত্তের রচিত "অক্রুর সংবাদ" ও "দুর্গামঙ্গল" নামে দুটি পালাও বেশ সুঅভিনীত হত।

ঠিক এই সময়েই কোনার জমিদার দীননাথ চৌধুরীও একটি পেশাদার যাত্রাদল গঠন করেন। ঠাকুরদাস দত্তের রচিত ৩১টি গানসহ 'হরিশচন্দ্র পালা' এই দলে সুঅভিনীত হয়ে খুবই প্রশংসা পেয়েছিল। কোনার জমিদারের যাত্রাদল ছাড়া গোপীনাথ দাসও একটি পেশাদার যাত্রাদল খুলেছিলেন । এই দলে ঠাকুরদাস দত্তের কৃত "শ্রীরামের দেশাগমন"ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'রাসযাত্রা' পালা বেশ সুনাম অর্জন করেছিল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ফুলেশ্বরের আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর একটি পেশাদার যাত্রাদল ছিল বলে জানা গেছে। ইনি নিজেও একজন নাট্যকার ছিলেন। বাংলা ১৩১০ সালে এঁর লেখা গীতাভিনয় 'চন্দ্রহাস' প্রকাশিত হয়। এছাড়া, এই দলে ঠাকুরদাস দত্তের 'লক্ষ্মণ বর্জন' পালাটিও অভিনীত হ'ত। আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক যাত্রাদল হলো 'উলুবেড়িয়া গ্রেট বেঙ্গল অপেরা'। এই দলটি গঠন করেন রাজকুমার ন্যায়রত্ন। রাজকুমারবাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর 'চন্দ্রহাস' পালাটিকে সংশোধন করে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পন্ডিত প্রবর উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'হরধনুভঙ্গ' নাটকাভিনয় করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন ব্যাঁটরা অবৈতনিক যাত্রাভিনেত্র সমিতি এবং সমিতির অভিনীত যাত্রা-নাটকাভিনয় এই অঞ্চলে উৎসাহের সঞ্চার করে।

পরবর্তীকালে হাওড়ার শিবপুর নিবাসী উমাচরণ বসু এক যাত্রাদল গঠন করেন এবং সেই সঙ্গেই তাদের অভিনীত ও ঠাকুরদাস দত্ত লিখিত 'শ্রীবৎস চিন্তা' নাটকাভিনয় বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এই সময়ে শালিখাতে বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ষষ্ঠী অপেরা' । এই দলে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয় বসন্ত' এবং রাইচরণ সরকারের 'কর্মফল' প্রভৃতি নাটক সুঅভিনীত হয়েছিল। ষষ্ঠী অপেরার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ার আঁদুল নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা'। তৎকালে এই দলের কার্যালয় ছিল নতুন বাজারে। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শম্বরাসুর' পালা অভিনয় করে এই দল সেকালে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এছাড়া শালিখাতে আরও একটি পেশাদারী যাত্রাদলের অধিকারীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে, তিনি হলেন কলডাঙ্গা লেনের গোবিন্দ অধিকারী ।

বিখ্যাত মথুরনাথ সাহার যাত্রাদলটি উঠে গেলে হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের যশস্বী নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বিশ শতকের প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সংঘ'। নিমতলা স্ট্রীট ও চীৎপুর রোড়ের সংযোগস্থলে ছিল এর কার্যালয়। হরিপদ বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নাট্যকার পশুপতি চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন এই দলটি পরিচালনা করেন। হরিপদবাবুর 'জয়দেব' ও 'পঞ্চরাত্র' এবং পশুপতিবাবুর 'তাপসকুমারী' ও 'লাঁয়লামজনু' পালা এখানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

এই সময় বিখ্যাত না হলেও আর একটি পেশাদার যাত্রাদল বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এই দলটি ছিল বাগনানে পাতিনান গ্রামের ভগবান মন্ডলের যাত্রাদল। এদের পরিচালনায় 'কল্কি অবতার' ও 'অনন্ত মাহাত্ম্য' নাটক দুখানি বেশ প্রশংসা অর্জন করেছিল। আর এরই পাশাপাশি বাঙ্গালপুর গ্রামের অমূল্য চক্রবর্ত্তীও একটি পেশাদার যাত্রাদল গঠন করেছিলেন, তবে তা তত জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। এই প্রসঙ্গে সামতার মনি রায়ের 'মনসামঙ্গল অপেরার'ও নাম করা যেতে পারে। সে যুগে মনি রায়ের নাটক পরিচালনার উৎকর্ষতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মন্তব্য যে, তাঁর যাত্রাদলের নিজস্ব সাজসরঞ্জাম কোলকাতার মথুর সার যাত্রাদলের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

হাওড়া জেলার বিখ্যাত যাত্রাদল আর্য অপেরা র প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন চাকুর গ্রামের পরেশ রায় এবং তখনকার আর্য অপেরার প্রায় অধিকাংশ অভিনেতাই ছিলেন বাগনান অঞ্চলের অধিবাসী। পরে মতান্তর ঘটায় পরেশবাবু আর্য অপেরার দায়িত্ব ছেড়ে 'রায়

অপেরা' খোলেন এবং 'রায় অপেরার' সুঅভিনীত বই ছিল 'কালাপাহাড়'। পরেশবাবু আর্য অপেরার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করায় আর্য অপেরার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কল্যাণপুর গ্রামের অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক। কিন্তু এই সম্পর্কে আর এক ভিন্ন মত হল, ১৩৩৭ সালে শশিভূষণ হাজরার দল উঠে যাওয়ায় এই দলের স্বত্ব ক্রয় করেন কল্যাণপুরের শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক। তার পরেই 'আর্য অপেরা' নাম নিয়ে এই দলের যাত্রা শুরু হয়। তবে প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে যাই হোক্ না কেন্, আর্য অপেরার স্বত্বাধিকারী অতুলবাবু শুধু দলের স্বত্বাধিকারীই ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন সফল নাট্যকার ছিলেন এবং তাঁর রচিত নাটকগুলি আর্য অপেরায় সুঅভিনীতও হয়েছে। সবচেয়ে এই দলের উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল কানাইলাল শীলের 'বীরপূজা' এবং ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রহাস' ও 'সাধু তুকারাম'। খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও এই সময় কাজিভুঁয়েড়ার রামচন্দ্র মেটের কৃষ্ণযাত্রার দলও গ্রাম-গ্রামান্তরে খুব প্রশংসা অর্জন করেছিল।

পরবর্তীকালে নাট্যভিনয়ের ক্ষেত্রে হাওড়া সমাজের 'নদের নিমাই' গীতাভিনয় এক জনপ্রিয় পালা হিসাবে আদৃত হয়। তারপরে হাওড়ার বারুইপাড়া আনন্দসমাজ কর্তৃক অভিনীত 'নদের যাত্রা' এবং 'সাধু তুকারাম' একান্তই জনপ্রিয় হয়। এই জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ, এর প্রতিষ্ঠাতা নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণী) মহাশয়ের অবদান। নাট্যাচার্য হিসেবে ইনি বহু শিক্ষার্থীকে যেমন অভিনয়শাস্ত্র সর্ম্পকে জ্ঞান দান করেছেন, তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্যে 'অভিনয় দর্পন' নামে পুস্তকও রচনা করেছিলেন।

কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবন বিন্যাসে নানারকম পরিবর্তন আসায়, যাত্রাগানের মধ্যেও কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনী পরিত্যাগ করে সমাজিক সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যাত্রাভিনয় শুরু হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে দুর্ধর্ষ যাত্রাবীর মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রার মাধ্যমে দেশে জাতীয়তাবাদের এক প্লাবন আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঠিক এই ধরনের স্বদেশী যাত্রার টেকনিককে অনুসরণ করে সে যুগের বিখ্যাত জননায়ক ও তদানীন্তন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের একজন ঘনিষ্ঠ নেতা বাঙ্গালপুর গ্রামের বিভূতি ঘোষ খুলেছিলেন স্বদেশী যাত্রার দল। শুধু খোলাই নয় — স্বহস্তে দেশাত্মবোধমূলক বহু নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন।

যাই হোক, সমাজ জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে একথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি হল সিনেমা-থিয়েটারের এত সব প্রতিযোগিতা সত্বেও যাত্রাভিনয়ের আকর্ষণ মোটেই কমে যায়নি। তবু এখনও গ্রামের সবুজ প্রান্তর যাত্রাদলের সেনাপতির বা নায়কের কপট হুংকারে কেঁপে ওঠে, দুর্ধর্ষ রাজার অত্যাচারে গণসমাজের চিত্ত ব্যথিত হয়ে ওঠে এবং দুষ্টের দমনকারী রাজপুত্রের ব্যবহারে উৎফুল্ল হয়। লোকজীবনের সঙ্গে এমন একাত্ম যোগাযোগ বাংলার লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের মত যাত্রাভিনয়ও একান্ত গভীরে প্রভাব বিস্তার করতে যে সমর্থ হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতায় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই সময় থেকেই থিয়েটারী ভাবধারা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার কদর কমতে থাকে। নাট্যামোদী জনগণ তখন চমৎকারিত্বের সন্ধানে থিয়েটারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অনুসন্ধানে জানা যায়,

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার চাঁদমারী ব্রীজের কাছে ঘোষ পরিবারের বাড়িতে নিয়মিত থিয়েটার অভিনয় শুরু হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঁটরার কোন এক নাট্যসম্প্রদায় শোভাবাজারের বেনেটোলার কার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতে 'মার্চেন্ট অফ ভিনিস' নাটকাভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন এমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কালী ব্যানার্জি লেনে তাদের বাড়ির ঠাকুর-দালানে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্যান্সী থিয়েটার। তার পরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় আইনজীবী শিবচন্দ্র বসুর চেষ্টায় এম. সি. ঘোষ লেনে প্রতিষ্ঠিত হয় এরিয়ান থিয়েটার। পেশাদারী নাট্যশালা হিসাবে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চিন্তামণি দে রোডে কমলা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ থিয়েটারও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। এর পর হাওড়ার অপেশাদার যে সব প্রতিষ্ঠান নাট্যাভিনয় সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শালিখা সঙ্গীত সমাজ (পরে গোবর্ধন সঙ্গীত সমাজ নামকরণ হয়), ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শালিখা বান্ধব সমিতি এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হাওড়া নর্থ ক্লাব। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি সে সময় ৭০০ দর্শকের আসনযুক্ত একটি ঘূর্নায়মান স্থায়ী মঞ্চও নির্মাণ করে নাট্যমোদীদের প্রশংসাধন্য হয়েছিল।

কলকাতায় স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলেও হাওড়ায় সেসময় তেমন কোন স্থায়ী পেশাদার নাট্যশালা না থাকায়, পরবর্তীকালে এ অভাব পূরণে এগিয়ে আসেন শালিখার বাবুডাঙ্গার নফরচন্দ্র আটার সুযোগ্য পুত্র বিষ্ণুপদ আটা। সে সময় নফর বাবু লোহা-লক্কড় ঢালাই কারখানা খুলে যথেষ্ট সম্পদের অধিকারী হন এবং এখনও তার প্রতিষ্ঠিত 'আটাস আয়রন ফাউন্ড্রি' সেই উদ্যম ও প্রচেষ্টার স্বাক্ষর হয়ে আছে। বিষ্ণুপদবাবুর উদ্যোগে সে সময়ে বহু অর্থ ব্যয়ে হরগঞ্জ বাজারের সামান্য পশ্চিমে এই নাট্যশালা ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় নাট্যশালার উপযোগী করে ঐ বিশাল ও সুদৃশ্য ভবনটি নির্মিত হয় এবং এই ভবনে মঞ্চ সংক্রান্ত যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম বসানো হয়। নাট্যশালার নামকরণ করা হয় 'নাট্যপীঠ'। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার এ মঞ্চের দ্বারোদঘাটন হয় এবং এই উপলক্ষে রায় জলধর সেন পৌরহিত্য করেন। সে সময়ের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় এ বিষয়ে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয় তা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। সে সংবাদটি নিম্নরূপ ঃ

"গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শালিখা নাট্যপীঠের দ্বারোদঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নাট্যপীঠ শালিখার সর্বপ্রথম পাকা রঙ্গালয়... এই নবগৃহের বাহির ও ভিতরের সৌন্দর্য কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগারগুলি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। দ্বারোদঘাটন উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া যে বহু সাহিত্যিক ও শিল্পী সেদিন নাট্যপীঠে সমবেত হইয়াছিলেন তাহারা সকলেই শালিখার মত জায়গায় সকল দিক দিয়া আধুনিক এইরূপ একটি রঙ্গালয় দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেন।

উৎসব সভায় পৌরহিত্য করেন শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক দুই-চার কথায় এই নাট্য ভবনের উন্নতি কামনা করিলে সভাপতি মহাশয় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার পর নৃত্যগীত ও ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। নাট্যপীঠের পরিচালকবর্গের সৌজন্যপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে অভ্যাগতবর্গ বিশেষরূপে আপ্যায়িত হন।"

সেদিনের 'নাট্যপীঠ' আজ আর রঙ্গালয় হিসাবে তার অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেনি। পরবর্তীকালে এটি সিনেমা হাউসে রূপান্তরিত হয় বলেই, নতুন ভাবে এর নামকরণ হয় 'নব নাট্যপীঠ'। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে এটির পুনরায় নাম পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায় 'পিকাডেলী', অর্থাৎ আজকের শালিখার এই পিকাডেলী সিনেমা হলই হ'ল সেদিনের নাট্যপীঠ রঙ্গালয়।

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে হাওড়ায় সর্বপ্রথম রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার এই হল ইতিহাস। প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুপদ আটার নামও আজ জনমনে বিস্মৃতি আনলেও তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে সংগঠিত গ্রন্থাগার শালিখার 'বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার' এই জেলার এক সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার ব্যাঁটরার কালীপ্রসন্ন পাইন, রাজকুমার দেউটি ও ব্যোমকেশ অধিকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠা হয় 'ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজ', যা সে সময়ে নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে বেশ সাড়া জাগায়। এর পর ব্যাঁটরায় নাটকাভিনয়ের জন্য খ্যাতিলাভ করে 'দক্ষিণ ব্যাঁটরা সান্ধ্য সম্মিলনী'।

শহরের নাট্যাভিনয় ও রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার এইসব উদ্যোগ ছাড়াও, গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু নাট্যামোদী নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে একান্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। হাওড়ার আমতা থানার ঝিখিরা গ্রামে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয় থিয়েটার ক্লাব হিসাবে 'ঝিখিরা বান্ধব সম্মিলনী' যা জনমানসে বেশ সাড়া জাগায়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ প্রফুল্ল রায় নির্দেশিত যে সব নাটক বিভিন্ন সময়ে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় সেগুলি হল, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেব, বঙ্গে বর্গী, দেবলাদেবী, যুদ্ধক্ষেত্র, প্রফুল্ল, বঙ্গের প্রতাপাদিত্য, রাতকানা, চন্দ্রগুপ্ত, প্রাণের দেবী, পথের শেষ প্রভৃতি। পরবর্তীসময়ে এই জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে সৌখিন থিয়েটার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বাগনান থানার বাইনান গ্রামের উপেন কাঁড়ারের ব্যবস্থাপনায় থিয়েটারের স্টেজ ও স্ক্রীন এ বিষয়ে থিয়েটারমোদীদের আশা পূর্ণ করে।

হাওড়া জেলার সেকালের নাট্যসম্প্রদায়ের পর একান্তই উল্লেখ করতে হয় এই জেলার নাট্যকার সম্প্রদায়ের। এই জেলার খ্যাতিমান নাট্যকার হিসাবে প্রথমেই নাম করতে হয় ঠাকুরদাস দত্তের। ইনি নিজ যাত্রাদলের জন্য 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক ছাড়াও বিভিন্ন দলের প্রয়োজনে আরও চারখানি ভিন্ন ভিন্ন রচনার বিদ্যাসুন্দর নাটক প্রণয়ন করেন। বিস্ময়ের কথা হল যে, তাঁর রচিত এই পাঁচখানি নাটকের কোনটির সঙ্গে কোনটির এক লাইনেরও মিল ছিল না। বিভিন্ন নাট্যদলে পূর্বে উল্লিখিত তাঁর রচিত নাটকগুলি ছাড়াও, তিনি আরও যেসব নাটক রচনা করেন, তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নলদময়ন্তী, কলঙ্ক ভঞ্জন, শ্রীমন্তের মশান, অক্রুর সংবাদ, শ্রীবৎস চিন্তা প্রভৃতি। ব্যাঁটরার এই সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারের রচনাবলী সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু আলোচনা হয়নি। সেজন্যই শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ মুস্তফী একদা লিখেছিলেন, 'ইহার গীতরাশি ও যাত্রার পালা কয়টি গৃহীত হইলে, বাংলা ভাষার তদানীন্তন সাহিত্যের অবস্থা-অনুসন্ধানে অনেকটা সাহায্য হইতে পারে।"

গাজীপুর গ্রামবাসী গোবিন্দ পাঠকের রচিত হরিশচন্দ্র, কীচক বধ, পান্ডবের অজ্ঞাতবাস, শিখিধ্বজ, দান পরীক্ষা, নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি এবং এ জেলার কানসোনা গ্রামের মতিলাল চক্রবর্তীর শঙ্খচূড় বধ্, শাল্ববধ প্রভৃতি পৌরাণিক পালা এককালে শহর ও গ্রামে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এ জেলার সাঁতরাগাছির রাধামাধব কর সেকালের

বিখ্যাত নটশিল্পী হলেও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বসন্তকুমারী' নামে একটি নাটক রচনা করেও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর একজন নাট্যকার হলেন কল্যাণপুরের হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ইনি প্রায় তেইশখানি নাটক এবং পনেরখানি ধর্মপুস্তক লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। এঁর 'জয়দেব' নাটকখানি একসময়ে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিলো এবং পরে তা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। হরিপদবাবু ছাড়া সেকালের নাট্যকার হিসাবে গোয়ালবেড়িয়ার অক্ষয় গঙ্গোপাধ্যায় 'পান্ডব বিলাপ' প্রভৃতি নাটক লিখে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। ঝিখিরার বিখ্যাত নাট্যামোদী প্রফুল্ল রায় নটশিল্পী ও নাট্য নির্দেশক হলেও, তিনি 'নবজীবন' ও 'মধুরে মধুর' নামক দু'খানি নাটকও রচনা করেন। উপেন্দ্র বিদ্যাবিনোদের 'হরধনু ভঙ্গ', আশুতোষ চক্রবর্তীর 'চন্দ্রহাস' এবং যশস্বী নাট্যকার ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদের 'সাধু তুকারাম' প্রভৃতি নাটকের রচনাকৌশল একান্তই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পাতিহালের সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সুরাসুর' নাটকখানি একদা যাত্রামোদী সমাজে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ব্রজেন দে মহাশয়, এককালে বাগনান থানার এলাকাধীন বাইনান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে থাকাকালীন বহু নাটকই এখানে বসে রচনা করেছিলেন। ক্লাইম্যাক্স (Climax) - এর চমৎকারিত্বে এবং সাবলীল ভাষার কারিগরীতে ইনি যাত্রা-নাটকের বইয়ে যুগান্তর এনেছিলে বলা যায়।

মুদ্রিত নাটক না হলেও গোপালপুরের অমূল্য দত্তের লেখা বহু নাটকই বাগনান অঞ্চলে সুঅভিনীত হয়েছে এবং এর লেখা 'রামপাল' নাটকখানিই সুমান অর্জন করেছিলো সবচেয়ে বেশী। মহিষরেখার সুষেন মন্ডলের 'সমাজ সতী' নামক সামাজিক নাটক একান্তই উল্লেখযোগ্য। শালিখার ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে কবি-সাংবাদিক ও নাট্যকার হিসাবে হরিশচন্দ্র মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। 'মীরাবাঈ', 'পারের আলো' এবং 'যুগাবতার' নাটক রচনা করেন শালিখার বিখ্যাত নাট্যাভিনেতা তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। বালীর ডিংসাই পাড়ায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকার ও গীতিকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অনুপ্রেরণায় বালী ইউনিয়ন ক্লাবে বিভিন্ন নাটকের অভিনয় হয়, যার নির্দেশনায় ছিলেন প্রসাদকুমার ঘোষাল। এছাড়া, বালীর অন্য একজন খ্যাতনামা নাট্যকার মনমোহন গোস্বামীর রচিত নাটকও কলকাতার বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে অভিনীত হ'ত বলে জানা যায়। আঁদুলের মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কবিরত্ন অনেক যাত্রার পালা ও গীত রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে নলদময়ন্তী ও সাবিত্রী-সত্যবান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, তাঁর প্রধান কীর্তি, নিজেকে 'প্রেমিক' আখ্যা দিয়ে সহস্রাধিক 'কালীনাম' সঙ্গীত রচনা। পরবর্তী যুগে ওড়ফুলীর করুণাসিন্ধু পালিত 'হাসি ও অশ্রু' নামে একটি সামাজিক নাটক প্রণয়ন করেন। বেতার-খ্যাত নাট্যকার বাণীকুমার এই জেলার অধিবাসী এবং তাঁর রচিত বহু নাটক একান্তই প্রশংসা অর্জন করেছে।

এই প্রসঙ্গে নাট্যকার হিসাবে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলতে হয়। জীবনের বেশ কিছুদিন তিনি সামতাবেড়েতে কাটিয়ে গেছেন এবং তার নাট্য পুস্তকগুলির অধিকাংশই এই সামতাবেড়েতে থাকাকালীন রচিত।

মোটামুটি এই হলো হাওড়া জেলার যাত্রা-নাটকের ইতিহাস। প্রহসনও বহু রচিত হয়েছে এই জেলার শিল্পীদের লেখনীতে, যাদের পরিচয় অজানা থেকে গেছে।

১২

জেলার স্থানীয় স্বশাসন

খ্রীষ্টীয় আঠার শতকে জেলার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় স্বায়ত্বশাসন নামে এক প্রথা চালু ছিল। এই প্রথার সঙ্গে অবশ্য সরকারী প্রশাসনের কোন সম্পর্ক ছিল না। আসলে এই স্বায়ত্বশাসন প্রথা চালু করেছিলেন সেকালের জমিদার সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। স্থানীয় জমিদারদের নিয়ন্ত্রিত এই স্বায়ত্বশাসন প্রথাকে গ্রামাঞ্চলে বলা হত 'মোড়লি প্রথা', অর্থাৎ জমিদারদের পক্ষ থেকে পছন্দমত প্রতি গ্রাম পিছু পাঁচ জন ব্যক্তিকে মন্ডল বা মোড়ল নিযুক্ত করা হত, যাদের কাজ ছিল গ্রামের দেখভালের নামে প্রজাদের কাছ থেকে যথাযথ খাজনা ও আবওয়াব আদায়ে জমিদারী গোমস্তাদেব সঙ্গে সহযোগিতা করা বা খাজনা অনাদায়েব ক্ষেত্রে গ্রামবাসী প্রজাকে শায়েস্তা করা। অবশ্য এই সঙ্গে তারা স্বায়ত্বশাসনের নামে গ্রাম্য বিচার করতেন, বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দিতেন এবং জরিমানা হলে আদায়ীকৃত সেই টাকা গ্রামের উন্নয়নে অথবা গ্রাম্য ভোজসভার অনুষ্ঠান করে ব্যয় করা হত। এই সব মোড়লি প্রথায় যিনি প্রধান হতেন তাকে বলা হত গ্রাম প্রধান মাতব্বর।

খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে তদানীন্তন সরকার স্বায়ত্বশাসন চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেজন্য ১৮৩৫ সালে, গ্রামে চৌকিদার ও শহরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তির বিষয়ে সরকার কতকগুলি প্রণিয়ম পাশ করে। কিন্তু তার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের উদ্দেশ্য যথাযথ রূপায়িত হয় না। পরে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই ধরনের শহর পরিষ্কার রাখা তত্ত্বাবধায়কের কাজকর্ম, ট্যাক্স আদায় ও স্থানীয় তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ সাধারণের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী ১৮৫৬ সালে গৃহীত বিধি অনুসারে হাওড়ায় ১৮৬০ সালে ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েত ইত্যাদি স্থাপন করা সত্ত্বেও শহরের রাস্তাঘাট, জল-নিষ্কাশন ও শহর পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে তেমন কোন উন্নতি সাধন হয়নি। এর পর ১৮৫৮ সালের ১২ আইন মোতাবেক, ১৮৬২ সালে সরকার চোদ্দজন সদস্য মনোনীত করে এক মিউনিসিপ্যালিটি কমিটি গঠন করে এবং ১৮৬৩ সালেব ১৯ শে জানুয়ারি তারিখে বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার জি. গ্রোডেনের সভাপতিত্বে এই কমিটির প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ সালের মিউনিসিপ্যাল ডিস্ট্রিক্ট ইমপ্রুভমেন্ট আইন অনুযায়ী হাওড়ার মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা পুনর্গঠন করা হয়। এইসময় ১৮৬৪ সালের ৩০ আইন অনুসারে হাওড়া পৌরসভার এলাকার মধ্যে সে সময় বালী এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে, তবে ১৮৮৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বালীতে পৃথক পৌরসভা স্থাপিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে উলুবেড়িয়াতে একটি পৌরসভা স্থাপিত হলেও নানাকারণে সেটিকে ১৯০৭ সালে তুলে দেওয়া হয়। অতঃপর্ হাওড়া পৌরসভা নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১৮৯৬ সালে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করে এবং ১৮৯৮ সালে পৌরসভার উদ্যোগে হাওড়া শহরে আসে গ্যাসের আলো।

১৮৭১ সালের ১০ আইন অনুযায়ী জেলার কালেক্টারকে সভাপতি করে হাওড়া জেলা রোড সেস কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে, তদানীন্তন

জেলার প্রশাসক ই. ভি. ওয়েস্টম্যাকট-এর সভাপতিত্বে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় হাওড়া জেলা বোর্ড, যার উপর দায়িত্ব বর্তায়, গৃহ ও পথকর এবং রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর নির্ধারণ ও আদায় প্রভৃতি কাজের। অন্যদিকে একই সঙ্গে হাওড়ার সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমায় রাস্তা ও ফেরিঘাট রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে মহকুমা শাসকদের সভাপতিত্বে দুটি লোক্যাল বোর্ড স্থাপন করা হয়, কিন্তু ১৯৪০ সালে লোক্যাল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে হাওড়ার সদর মহকুমার অর্ন্তগত ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুর থানায় এবং উলুবেড়িয়া মহকুমার অর্ন্তগত আমতা ও বাগনানে ইউনিয়ন কমিটি স্থাপন করা হয়। ১৯০৭ সালে উলুবেড়িয়া পৌরসভা তুলে দেওয়ার জন্য সেখানে ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উলুবেড়িয়া ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম আইনে জেলার স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগুলির প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। ফলতঃ ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন অনুযায়ী গ্রামের সেবামূলক এবং গ্রাম্য আরক্ষকার্য যথাযথ দেখভালের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয়। এই সময়ে সদর মহকুমায় ৩৪টি এবং উলুবেড়িয়া মহকুমায় ৪৮টি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন অনুযায়ী গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েত স্থাপন করার কারণে এইসব ইউনিয়ন বোর্ডের অবলুপ্তি ঘটে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুযায়ী স্থানীয় স্বশাসনে জনগণের অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ ২৫ আইন অনুসারে ১৯৬৪ সালে হাওড়া জেলা বোর্ড হাওড়া জেলা পরিষদে রূপান্তরিত হয়, যার শতবর্ষ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে চার স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। অর্থাৎ, জেলা পরিষদ, প্রতিটি অঞ্চল উন্নয়ন করণ পর্যায়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত। পরবর্তী ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে পূর্বের চার স্তরের বদলে ১৯৭৮ সাল থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয় এর সেইমত জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। বর্তমানে এ জেলায় ১৪টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং তার অধীনে ১৫৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।

হাওড়া শহরে হাওড়া পৌরসভা পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী হাওড়া পৌর নিগম (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৯২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়ায় পুনরায় স্থাপিত হয় উলুবেড়িয়া পৌরসভা।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া শহরের উন্নতি বিধানের জন্য স্থাপিত হয় হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, যার কার্যাবলীর মধ্যে নির্দিষ্ট হয়েছে জলসরবরাহের উন্নতি সাধন, সড়ক উন্নয়ন, জঞ্জাল অপসারণ, পয়ঃ প্রণালী সংস্কার, পার্ক ও উদ্যান নির্মাণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি।

জেলার বিশিষ্ট স্থানের বিবরণ

অমরাগড়ি ঃ আমতার পশ্চিমে ৯'৬ কি মি. দূরত্বে জয়পুর থানার এলাকাধীন আমরাগড়ি গ্রামটি অবস্থিত। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এই এলাকায় ফকিরদাস রায়ের উদ্যাগে যে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তারই ফলে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয়। এছাড়া, কেশবচন্দ্র সেনের পদধূলিধন্য এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দির, যার স্থাপত্যের সঙ্গে কলকাতার কেশব সেন স্ট্রীটের ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দিরের তুলনা করা যেতে পারে। বর্তমানে এ গ্রামে মেনকা স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়, একটি ডাকঘর ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র অবস্থিত। এখানে আষাঢ়ের রথ ও আশ্বিন মাসে কালীপূজা এবং বৈশাখে মানিকপীরের উৎসব উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া, এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য দুটি পুরাকীর্তি হল, রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত গজলক্ষ্মীর আটচালা রীতির এবং ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দধিমাধবের আটচালা রীতির মন্দির। উভয় মন্দিরের সম্মুখভাগের দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য-ফলক সজ্জা।

আঁদুল (বর্তমানে আন্দুল) ঃ প্রাচীন সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত শাঁকরাইল থানার এলাকাধীন এই বর্ধিষ্ণু গ্রাম আঁদুল। দক্ষিণপূর্ব রেলপথের আন্দুল স্টেশন থেকে এখানকার দূরত্ব ২.৪ কি.মি. এবং হাওড়া রেল স্টেশনের কাছ থেকে আঁদুলগামী বাসেও এখানে আসা যায়। এখানকার আঁদুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন রায় ছিলেন একদা ক্লাইভের দেওয়ান। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে 'রাজা' খেতাব পান। এ রাজবংশের নির্মিত অতি বৃহৎ গ্রীসীয় স্তম্ভশোভিত এক বিশাল অট্টালিকা এক উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য। এ গ্রামে ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর কর্তৃক ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক আটচালা মন্দির এখানের এক পুরাকীর্তি । এছাড়া এখানে চৌধুরী পরিবার কর্তৃক ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বর শিবের আটচালা, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত মাধবেশ্বর শিবের আটচালা এবং সমসাময়িক নকুলেশ্বরের আটচালা মন্দিরগুলি এখানকার পুরাকীর্তি। আঁদুলের প্রেমিক মহারাজ নামে খ্যাত সাধক কবি মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এখানকার আঁদুল কালীকীর্তন সমিতির স্রষ্টা এবং তাঁর রচিত নলদময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি কয়েকটি নাটক ছাড়া তাঁর শাক্ত বিষয়ক সঙ্গীতাবলী ও পদগুলি বাঙ্গলা শাক্তপদ সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

আমতা ঃ হাওড়া স্টেশন থেকে হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (মুন্সীরহাট বা রানিহাটি হয়ে বাস চলে) হাওড়া থেকে প্রায় ৪০ কি.মি. পশ্চিমে, দামোদরের পূর্বতীরে আমতা থানার সদর আমতা। এই এলাকায় ডাকঘর, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, মুনসেফী আদালত ছাড়াও তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রামসদয় কলেজ ও আমতা সাধাবণ গ্রন্থাগার অবস্থিত। আমতা একসময়ে বানিজ্যবন্দর হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। তার কারণ, সে সময় তমলুক-হিজলী থেকে চালান আসত লবণ এবং রানীগঞ্জ থেকে কয়লা। সেজন্য দামোদর তীরবর্তী এখানের এক স্থানকে বন্দর নামে অভিহিত করা হত।

এখানকার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হল, দেবী মেলাই চন্ডীর মন্দির। জনশ্রুতি যে, সতীর হাঁটুর মালাই চাকি পতিত হওয়ার জন্য এ দেবীর নাম হয় মালাই থেকে মেলাই চন্ডী এবং তার এই অধিষ্ঠানক্ষেত্র হয় একান্ন পীঠের অন্যতম। পরবর্তীকালে, কলকাতা হাট-খোলার দত্ত পরিবারের লবণ ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের ডুবে যাওয়া কয়েকটি নৌকা দেবীর প্রসাদে পুনরুদ্ধার হওয়ায় তিনি বর্তমান এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। মন্দিরটি ইটের আটচালা রীতির এবং বহুবার সংস্কারের দৌলতে এ মন্দিরে কোন পোড়ামাটির অলংকরণ বা প্রতিষ্ঠালিপি ছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে সেবাইতদের মতে, এ মন্দিরের নির্মাণ-কাল খ্রীষ্টীয় সতের শতকের মাঝামাঝি সময়। মূল দেবালয়ের সামনে একটি নাটমন্ডপ ছাড়াও মন্দির চত্বরের দক্ষিণপূর্ব কোণে দুর্গেশ্বর শিবের আটচালা মন্দিরটি হাটখোলার কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের পুত্র মদনমোহন দত্ত নির্মাণ করে দেন বলে জনশ্রুতি।

আসণ্ডা ঃ উদয়নারায়ণপুর-ডিহিভুরশুট পিচের সড়কে, উদয়নারায়ণপুর থেকে ৪.৮ কি.মি. উত্তরে ঘোলা গ্রামের কাছ থেকে পশ্চিমমুখী কাঁচা রাস্তায় প্রায় দেড় কি.মি. দূরত্বে উদয়নারায়ণপুর থানার এলাকাধীন আসণ্ডা গ্রাম। এ গ্রামে শ্রীধরনাথের নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলকগুলি দেখা যায়, সেগুলির বিষয়বস্তু হল, লঙ্কাযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা এবং বিবিধ সামাজিক দৃশ্য। খিলান শীর্ষে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া, আলোচ্য মন্দিরটি সংলগ্ন পশ্চিমে হরসুন্দর শিবের যে আটচালা মন্দিরটি দেখা যায়, সেটি প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

গ্রামের বেরাপাড়ায় বেরা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত সীতারাম জীউর আটচালা মন্দিরটিতে সামান্য টেরাকোটা-সজ্জা ছাড়া আর কোন অলংকরণ নেই। কাছাকাছি শিবতলায় বুড়ো শিবের আর একটি অলংকরণবিহীন আটচালা মন্দির দেখা যায়। দুটি মন্দিরই স্থাপত্য বিচারে খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের শেষভাগে নির্মিত হয়ে থাকবে।

উদয়নারায়ণপুর ঃ হাওড়া-উদয়নারায়ণপুর পিচের সড়কে উদয়নারায়ণপুর থানা সদরের উদয়নারায়ণপুর মৌজা। প্রাচীন ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের কোন এক রাজা উদয়নারায়ণের নামেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান। এখানে স্থানীয় অঞ্চল উন্নয়ন করণ ও একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, একজোড়া আটচালা রীতির মন্দির যার একটিতে শিব ও অন্যটিতে ধর্মঠাকুর অধিষ্ঠিত। স্থাপত্য বিচারে মন্দির দুটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

উলুবেড়িয়া ঃ দক্ষিণপূর্ব রেলপথের উলুবেড়িয়া স্টেশনে নেমে পূর্বে দেড় কি.মি. দূরবর্তী অথবা হাওড়া-উলুবেড়িয়া বাসে জেলার অন্যতম মহকুমা শহর উলুবেড়িয়ায় যাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জোব চার্নকের সৈন্যদের সঙ্গে বাংলার নবাব ফৌজের হিজলীতে যুদ্ধ বাধায়, ইংরেজেরা পরাজিত হলে নবাবের সঙ্গে যে সন্ধি চুক্তি হয় তার প্রধান শর্ত ছিল ইংরেজেরা উলুবেড়িয়াতে বসতি স্থাপন করতে পারবে। সেইমত জোব চার্নক ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন বিধ্বস্ত অর্ধেক রণতরী নিয়ে উলুবেড়িয়ায় এসে হাজির

হয়। উলুবেড়িয়াতে ডক তৈরী ও জাহাজ মেরামতের সুবিধার জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অগাষ্ট চার্নককে লিখে জানান যে, মোগল দরবার থেকে প্রয়োজনীয় ফরমান লাভ করা গেলে, ভাগীরথী তীরবর্তী উলুবেড়িয়া এলাকাতেই ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করা উচিত। কিন্তু চার্নক পরবর্তী সময়ে মত পরিবর্তন করে সুতানুটিতে চলে যান ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগাষ্ট, যে তারিখটিকে ঐতিহাসিকরা জোব চার্নক কর্তৃক কলকাতা প্রতিষ্ঠার দিন বলে গণ্য করে থাকেন। এইভাবে অল্পের জন্য উলুবেড়িয়া পূর্বভারতে ইংরেজদের প্রধান কেন্দ্র হবার সুযোগ হারায়।

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের 'পাইলট চার্ট'-এ এবং ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের রেনেল-এর ম্যাপে এ স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরী তীর্থযাত্রীদের জন্য কটক রোড় (ওড়িশা ট্র্যাঙ্ক রোড্) নির্মিত হওয়ায় এবং এখানে একটি পান্থশালা স্থাপনের কারণে উলুবেড়িয়া ক্রমশই বিখ্যাত হতে থাকে। পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া ইরিগেশন এ্যান্ড ক্যানাল কোম্পানি উলুবেড়িয়া থেকে মেদিনীপুর শহর পর্যন্ত নৌ-পরিবহনের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর-ক্যানাল নামে একটি খাল খনন করে। এর ফলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর তীরবর্তী মহিষরেখায় স্থাপিত সে সময়ের সাব-ডিভিশন অফিসটি উলুবেড়িয়ায় উঠে আসে।

উলুবেড়িয়ায় ভাগীরথী তীরবর্তী আনন্দময়ী কালীর নবরত্ন মন্দিরটি এখানকার এক দ্রষ্টব্য। লিপিফলক অনুসারে মন্দিরটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। প্রতি শনিবার এখানে গবাদি পশুর এক বৃহৎ হাট বসে।

কলিকাতা ঃ আমতা থেকে উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের বাঁধ রাস্তায় ৪ কি. মি. দূরত্বে আমতা থানার অন্তর্গত কলিকাতা গ্রাম। এ গ্রামের ধর্মতলায় প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুরের আটচালা মন্দিরটি বেশ উল্লেখযোগ্য। সে মন্দিরের সামনের দেওয়ালে কিছু নকাশি পঙ্খের কাজ ছাড়াও প্রবেশপথের উপর নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ ঃ "শ্রীশ্রী ধর্ম্ম দেবতা মন্দির তৈয়ার হইল সন ১২০৪ সালে শ্রীগয়ারাম দেয়াসি মন্দির দেন সাং কলিকাতা শ্রীয়ভয় চরণ মিস্ত্রি সাং থলে।" প্রায় ২০০ বছর পূর্বের এ মন্দিরলিপিতেও যে গ্রামের নাম কলিকাতা বলে উল্লিখিত হয়েছে তা লক্ষণীয়। তাছাড়া, কাছাকাছি থলে গ্রামটিতে যে একদা মন্দির তৈরির কারিকররা, বসবাস করতেন তা এই লিপি থেকে জানা যায়।

এ দেবালয়ের সামান্য দক্ষিণে কাঁড়ার পরিবারের একটি ভগ্ন আটচালা শিবমন্দিরও এখানকার এক পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হলেও, সেটি সংস্কারাভাবে আগাছায় ঢাকা পড়ে গেছে। এছাড়া, এখানে প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন এক নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়। গ্রামে এক আধুনিক দালান মন্দিরে পূজিত ২.১ মি. উচ্চতাসম্পন্ন কাঠের শ্যামাকালীর মূর্তিটি দারু-ভাস্কর্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

কল্যাণপুর ঃ বাগনান-মানকুর পিচের সড়কে (বাস চলে) প্রায় ৮ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে বাগনান থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম। এ গ্রামের পুব প্রান্তে 'বুড়ো সাহেব' পীরের প্রাকার বেষ্টিত যে মাজারটি দেখা যায় সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণ এই মাজারে এসে মানত করেন এবং মনোবাসনা পূর্ণ হলে শিরনি দেন। এরই

কাছাকাছি খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালঞ্জয় শিবের এক আটচালা মন্দির। হিন্দু ও মোসলেম উপাসনাস্থলের এহেন নিকট সহাবস্থান পশ্চিমবাংলায় বিরল।

এছাড়া, এখানকার পালপাড়ায় পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দামোদরের নবরত্ন মন্দিরটি পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট সজ্জায় দর্শনীয় হলেও, গত ১৯৭৮ সালের প্রবল বন্যায় তা ধূলিসাৎ হয়। তবে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এখানের দালান-রীতির কালীমন্দিরটিতে দুটি প্রমাণ আকারের পোড়ামাটির দ্বারপাল ছাড়াও বেশ কিছু পঙ্খের নকাশি কাজ দেখা যায়। এ মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটি আটকোণা রাসমঞ্চ আছে।

গ্রামের প্রামাণিক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত দামোদরজীউর অলংকরণবিহীন পঞ্চরত্ন মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রায়। সেকালে বিখ্যাত 'জয়দেব', 'পদ্মিনী' প্রভৃতি নাটক রচয়িতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

খড়িয়প ঃ আমতা থেকে আমতা-ঝিখিরা পিচের সড়কে প্রায় ৩ কি.মি. পশ্চিমে আমতা থানার এলাকাধীন খড়িয়প গ্রাম। এখানে স্থানীয় বিত্তশালী জমিদার বসু পরিবারের বসতবাড়িটি বিরাটাকার সাতমহলা, যা ২৪৮টি কুঠরিতে বিভক্ত। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্মশানকালী মন্দিরটি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কালীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পাঁচদিন ব্যাপী এক মেলা বসে। এছাড়া, এখানে চৈত্র সংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখে যথাক্রমে নীলের গাজন ও চড়ক উপলক্ষেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় দীর্ঘাঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত স্বয়ম্ভু খড়োশ্বর শিবের আটচালা মন্দিরটি ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে নির্মিত তা মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। মন্দিরের সামনের রোয়াকে একটি পাথরে খোদাই গণেশমূর্তি এবং পাথরের একটি দ্বারপার্শ্ব পড়ে থাকতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত কোন লুপ্ত মন্দির থেকে এগুলি সংগৃহীত।

আলোচ্য এই মন্দিরের পুবদিকে 'ফিঙ্গা দিঘি' নামে পরিচিত এক বড় দিঘির পাড়ে এক উঁচু ঢিবিকে সাধারণ লোকে কোন এক ফিঙ্গা রাজার ঢিবি বলে থাকেন। জনশ্রুতি যে, দিঘিটি নাকি ঐ ফিঙ্গারাজা কর্তৃক খনিত এবং ঢিবিটি নাকি তার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

খালনা ঃ বাগনান রেল স্টেশন থেকে, বাগনান-খালনা পিচের সড়কে প্রায় ১০ কি.মি. উত্তরে জয়পুর থানার এলাকাধীন গ্রাম খালনা। স্থানীয় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণরায় জীউর মন্দিরটিই প্রাচীনতম। এ মন্দিরের সম্মুখভাগে একদা বেশ কিছু টেরাকোটা অলংকরণ ছিল, যা বর্তমানে সংস্কারের ফলে সেগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। কাছাকাছি ক্ষুদিরায় জীউয়ের মন্দিরটি সাধারণ এক দালান রীতির এবং সামনের প্রাঙ্গনে ছয়কোণা যে দুটি রাসমঞ্চ আছে তা ক্ষুদিরায় ও কৃষ্ণরায়জীউর বাৎসরিক উৎসবে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া, বারুইপাড়ায় খটেশ্বর শিবের অলংকরণবিহীন আটচালা মন্দিরটি, উৎসর্গ-লিপি অনুসারে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। পশ্চিমপাড়ায় রায় পরিবারের দামোদর জীউর দালান মন্দিরটি পোড়ামাটির মূর্তি ও নকাশি ভাস্কর্যে অলংকৃত।

খালনা বাজারের কাছে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে নির্মিত ধর্মরাজের দালান মন্দির, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে স্থাপিত জলেশ্বর শিবের আটচালা ও জয়চণ্ডীর আটচালা মন্দির এবং পশ্চিমপাড়ায় খাঁ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন্দের পঞ্চরথ শিখর দেউল প্রভৃতি পুরাকীর্তির পর্যায়ে না পড়লেও এখানকার দর্শনীয় দ্রষ্টব্য।

খালোড় ঃ বাগনান রেল স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর পিচের সড়কে ১ কি.মি. দক্ষিণে বাগনান থানার অন্তর্গত খালোড় গ্রাম। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এ গ্রামের নাম সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লিখিত হয়েছে। পিচের রাস্তা সংলগ্ন এক দালান মন্দিরে অধিষ্ঠিত প্রায় ২.৫ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট কাঠের মহাকালী মূর্তিটি এখানকার এক প্রধান দ্রষ্টব্য। জনশ্রুতি যে, খালোড় পরগণার ভূতপূর্ব ভূস্বামী জনৈক রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় প্রায় চারশো বছর আগে দেবীর এই মূর্তি স্থাপন করেন। পুরাতন কাঠের মূর্তিটি ভগ্ন হয়ে গেলে, বর্তমান এই কাঠের মূর্তিটি ১২৯৫ বঙ্গাব্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রতিবৎসর ভাদ্র ও পৌষমাসের আমাবস্যায় মহাকালীর বিশেষ উৎসব উপলক্ষে যথাক্রমে তালকালী ও মূলোকালী নামে একদিনের মেলা বসে।

মহাকালী মন্দির প্রাঙ্গনে পুব ও পশ্চিমমুখী দুটি ছোট আটচালা মন্দিরে দেবীর ভৈরব হিসাবে বাণলিঙ্গ ও মৃত্যুঞ্জয় শিব প্রতিষ্ঠিত। মহাকালী মন্দিরের পশ্চিমে রাস্তার ধারে টালিছাওয়া এক দালান মন্দিরে বহু কূর্মমূর্তিসহ ধর্মদেবতা অধিষ্ঠিত আছেন।

গ্রামের বসুপাড়ায় খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত শ্রীধর জীউর আটচালা মন্দিরটিতে বেশ কিছু টেরাকোটা সজ্জা ছিল। কিন্তু বর্তমানে মন্দিরটি পরিত্যক্ত।

গড়চুম্বকঃ উলুবেড়িয়া-গড়চুম্বক পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শ্যামপুর থানার অন্তর্গত গড়চুম্বক গ্রাম (জে. এল. নং ৪৮), যা স্থানীয় কথ্য ভাষায় গড়চুমুক নামে খ্যাত। গ্রামের বড়বাড়ি এলাকায়, সুজন দিঘির পাড়ে, জঙ্গলাকীর্ণ এক ভগ্ন মসজিদ ও শাহসুজন পীরের মাজার দেখা যায়। ভগ্ন মসজিদের দু'একটি পাথরের স্তম্ভ কাছেই পড়ে আছে।

সম্প্রতি এখানকার গড়চুমুক ক্যানেল পাড়ে ১৩৭ একর এলাকা জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ ও হাওড়া জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে একটি বনভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই বনভূমির মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে মৃগদাব ও বাঘরোল প্রজনন কেন্দ্র। জঙ্গলভূমির এই পরিবেশে হাওড়া জেলা পরিষদ পর্যটকদের জন্য একটি 'হলিডে হোম' নির্মাণ করেছেন, যার ফলে সেটি একটি সার্থক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

গড়ভবানীপুর ঃ উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকা থেকে দক্ষিণে ৮ কি.মি. দূরত্বে আমতা-উদয়নারায়ণপুর পিচের সড়কে উদয়নারায়ণপুর থানার এলাকাধীন গ্রাম গড়ভবানীপুর। একদা ভুরশুট রাজবংশের যে তিনটি প্রধান গড় ছিল তার মধ্যে গড়ভবানীপুর সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু বর্তমানে সে রাজবংশের ভদ্রাসন বাড়ি বা তোষাখানা প্রভৃতির কোন চিহ্ন না থাকলেও দু'একটি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির, বেশ কিছু দিঘি ও গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এক বিস্তৃত গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। সেখানে এক উঁচু টিবির উপর প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ ভগ্ন ও জঙ্গলাবৃত যে দেবালয়টি দেখা যায় সেটি গড়ভবানীপুর রাজের গৃহদেবতা গোপীনাথ জীউর মন্দির বলে জনশ্রুতি।

গ্রামের হাট এলাকা সোনাতলার কাছে দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত মণিনাথ শিবের আটচালা মন্দিরটি স্থাপত্য বিচারে খ্রীষ্টীয় সতের শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

গয়েশপুর ঃ ডোমজুড়-জগদীশপুর পিচের সড়কে ডোমজুড় থানার এলাকাধীন এই গ্রাম। গয়েশউদ্দীন পীরের নামেই গ্রামের নাম গয়েশপুর এবং প্রতিবৎসর ৪ঠা মাঘ এই পীরের আবির্ভাব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। গ্রামে একটি প্রাচীন গড়ের চিহ্ন আজও দেখা যায়, যা প্রায় এক কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত।

গাজীপুর ঃ আমতা থেকে দামোদরের পশ্চিম তীরের বাঁধ বরাবর ২ কি.মি. দক্ষিণে আমতা থানার এলাকাধীন গাজীপুর গ্রাম (মৌজা ঃ পূর্ব গাজীপুর)। এ গ্রামে একদা বর্ধিষ্ণু জমিদার সিংহ মজুমদারদের খনিত বেশ কয়েকটি জলাশয় ও প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির গ্রামের অতীত গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ পরিবারের স্থাপিত গোবিন্দরায় জীউর দোতলা দালান মন্দিরটিতে বেশ কিছু পোড়ামাটির ভাস্কর্য অলংকরণ দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু লঙ্কাযুদ্ধ ও ফুললতাপাতার ভাস্কর্য। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ উৎসর্গলিপি অনুযায়ী এটি ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এ মন্দিরের শতাধিক মি. উত্তর-পুবে ঐ একই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত আটচালা শিবমন্দিরটি ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হলেও বর্তমানে পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ।

গ্রামের অন্যত্র যে দুটি অলংকরণবিহীন আটচালা রীতির জোড়া আটচালা মন্দির দেখা যায়, সেগুলি প্রতিষ্ঠালিপি অনুযায়ী ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

গাদিয়াড়া ঃ বাগনান রেল স্টেশন থেকে শ্যামপুর হয়ে দক্ষিণে পিচের সড়কে (বাস চলে) শ্যামপুর থানার এলাকাধীন গাদিয়াড়া গ্রাম। পুরাতন দলিলপত্রে এ স্থানকে 'মাকড়া-পাথর' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য, লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক নির্মিত 'ফোর্ট মর্নিংটন পয়েন্ট' নামে অভিহিত একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। শত্রুর রণতরী প্রভৃতিকে কামানের পাল্লার ভিতর রাখবার জন্য ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থলে এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লর্ড ক্লাইভ দুর্গটি নির্মাণ করেন। পববর্তীকালে দুর্গটি পরিত্যক্ত হওয়ায় এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নদীর ভাঁটার সময় ইটের লম্বা সুড়ঙ্গপথসহ নিমজ্জিত দুর্গের বিভিন্ন অংশ এখনও দেখা যায়। বর্তমানে ভ্রমণরসিকদের জন্য এখানে সরকারীভাবে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বিভাগ কর্তৃক একটি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

গোগুলপাড়া ঃ হাওড়া-উলুবেড়িয়া বাস-রাস্তায় ধূলোগড়ি হয়ে প্রায় ৬ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে পাঁচলা থানার অন্তর্গত গোগুলপাড়া গ্রাম। এখানকার হালদার পাড়ায় হালদার পরিবারের স্থাপিত দেবী চণ্ডীর জোড়বাংলা মন্দিরটি একান্ত দ্রষ্টব্য। মন্দিরটির সম্মুখভাগের দেওয়ালে রাম-রাবণ যুদ্ধের দৃশ্য পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ছাড়াও সেখানে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এ মন্দিরের পশ্চিমে ভারতী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত চাঁপা রায় ও দামোদর জীউ-এর একটি আটচালা মন্দির আছে, যেটি প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এছাড়া, গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে দেবী ভৈরবীর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আটচালা মন্দিরটিতে সামান্য টেরাকোটা-সজ্জা থাকলেও, অবৈজ্ঞানিক সংস্কারের দৌলতে সেগুলি বর্তমানে ক্ষয়প্রাপ্ত।

ঘুসুড়ি ঃ শালকিয়া ও লিলুয়ার মধ্যবর্তী হুগলী-ভাগীরথী তীরবর্তী এক শিল্পকেন্দ্রিক স্থান। খ্রীষ্টীয় পনের শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই রচিত মনসাবিজয় কাব্যে ঘুসুড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিলেতে চালান দেওয়ার উদ্দেশ্যে শন ও পাট পাক দিয়ে গাঁট তৈরীর কারখানা এখানে ১৭৯৬ সালে স্থাপিত হয়। এছাড়া মার্ক উডের ১৭৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাপেও দেখা যায় এখানে একটি পাটের দড়ি পাকাবার কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এমন কি, ১৮০১ সালেও এখানে একটি দড়ি পাকাবার কারখানার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে এই এলাকায় নির্মিত হয়েছে বেশ কিছু সুতো ও পাটকল এবং লোহা ঢালাই কারখানা প্রভৃতি।

এছাড়া, ঘুসুড়ি এলাকার গোঁসাইঘাট রোডে অবস্থিত ভোটবাগান মঠটি বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। আঠার শতকের শেষ দিকে তিব্বতের তাশীলামার অনুরোধে তিব্বতী তীর্থযাত্রী, বণিক ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের অবস্থানের জন্য তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস ঘুসুড়িতে যে ১০০ বিঘা ৮ কাঠা জমির বন্দোবস্ত দেন সেখানে দশনামী সম্প্রদায়ের পূরণ গিরির প্রযত্নে ও পাঞ্চেন লামার অর্থসাহায্যে এখানের এই মঠটি নির্মিত হয়। মঠটি এক দোতলা দালান, যার মধ্যে এক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিব্বত থেকে আনীত আর্যতারা, মহাকালভৈরব ও পদ্মপাণি প্রভৃতি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি। মঠের চত্বরে পূর্বতন মহন্তদের ছোটবড় দশটি সমাধি মন্দির আছে। দুঃখের কথা, এই এলাকায় দ্রুত শিল্পপ্রসারের ফলে মঠের বহু জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। তবু একসময়ে ভারত-তিব্বত সংস্কৃতির এখানে যে একটি মিলন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সে হিসাবে এ মঠের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

জগৎবল্লভপুর ঃ হাওড়া-উদয়নারায়ণপুর পিচের সড়কে হাওড়া থেকে প্রায় ২৬ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে কানা দামোদর তীরবর্তী জগৎবল্লভপুর থানার সদর গ্রাম জগৎবল্লভপুর। একদা রেশম ও সুতি বস্ত্র শিল্পের দৌলতে এ গ্রাম যে বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল তা স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ ও ভগ্ন অট্টালিকাগুলি থেকে প্রমাণ হয়। এ গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও এখানে একটি জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ আছে।

এখানের পিচের সড়কের পাশে পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আটচালা শিব মন্দিরটিতে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বেশ কিছু পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলক উৎকীর্ণ হয়েছে। অনুরূপ, এ দেবালয়ের সামান্য পুবে কালীতলা বাজারেও টেরাকোটা সজ্জাযুক্ত একটি আটচালা মন্দির আছে, যেটি ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ষষ্ঠীতলায় স্থাপিত আর একটি আটচালা মন্দিরও লিপিফলক অনুসারে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত। কাছাকাছি স্থাপিত মহেন্দ্রেশ্বর শিবের আর একটি আটচালা রীতির মন্দির ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

পিচের সড়কের পাশেই 'শাহী মসজিদ' নামে এক গম্বুজযুক্ত যে প্রাচীন মসজিদটি দেখা যায়, সেটি নাকি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি।

জগৎবল্লভপুর-ইছানগরীর সীমানায় একদা প্রবাহিত কানা নদীর ধারে বালির খাদ খননের সময় বেশ কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পোড়ামাটির

নলযুক্ত নানাবিধ মৃৎপাত্র ও দুটি টেরাকোটা মূর্তি। এছাড়া, কষ্টিপাথরে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি, বিষ্ণুপট্ট, ও উমালিঙ্গন মূর্তিও এখানে পাওয়া গেছে, যা থেকে অনুমান হয়, খ্রীষ্টীয় এগারো -বারো শতকে এখানে একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ গড়ে উঠেছিল।

জয়পুর ঃ আমতা থেকে আমতা-ঝিখিরা পিচের সড়কে প্রায় ৮ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে, জয়পুর ফকিরদাস ইন্সটিটিউশনের কাছ থেকে বাঁহাতি রাস্তায় ১ কি.মি. দূরত্বে জয়পুর থানার সদর এই গ্রাম। এ গ্রামে জনপ্রিয় লৌকিক দেবী জয়চণ্ডীর নামানুসারে গ্রামের নাম জয়পুর। পৌষ সংক্রান্তিতে জয়চণ্ডীর অন্নকূটই প্রধানতম স্থানীয় উৎসব। এছাড়া, এখানে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে সাঁতরাপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত মতিলাল ধর্মঠাকুরের আটচালা মন্দিরটি ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। জয়চণ্ডীতলায় দাস পরিবারের শ্রীধর জীউর আটচালা মন্দিরটি 'টেরাকোটা'-অলংকরণ সমৃদ্ধ এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। অন্যদিকে রায়পাড়ায় স্থানীয় রায় পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরটি ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দোতলা-দালান স্থাপত্য বিশিষ্ট। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় জলেশ্বর শিবের চারচালা বিশিষ্ট মন্দিরের সম্মুখভাগে স্থাপিত জগমোহনটিও চারচালা রীতির। এ মন্দিরে পালযুগের একটি কষ্টিপাথরে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তির অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, মন্দির প্রাঙ্গণে গণেশমূর্তি খোদিত একটি পাথরের চৌকাঠ পড়ে থাকতে দেখা যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় এগারো-বার শতকের কোন এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে এগুলি সংগৃহীত বলেই অনুমান।

ঝিখিরা ঃ আমতা-ঝিখিরা পিচের সড়কে, আমতা থেকে প্রায় ১৩ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে, জয়পুর থানার এলাকাধীন ঝিখিরা গ্রাম। গ্রামটিতে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এক চতুস্পাটি, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর ও গ্রন্থাগার প্রভৃতি বর্তমান। এছাড়া, এখনে শাকসব্জী, খাদ্যশস্য ও মাছ প্রভৃতি বেচাকেনাব দৈনিক বাজারটিও বেশ বড়সড়ো আকারের। এ গ্রামে বেশ কয়েকটি মন্দিরে নিবদ্ধ পোড়ামাটিব অলংকরণ-সজ্জা দেখা যায়। গ্রামের সরখেলপাড়ায় কাঠের তৈরি জয়চণ্ডীর মন্দিরটি আটচালা রীতির এবং সেটি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এ মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে গড়চণ্ডীর মন্দিরটি নবরত্ন রীতির এবং দেবী মূর্তিটিও কাঠের তৈরী। এ মন্দির দেওয়ালে সামান্য পোড়ামাটির অলংকরণ ছাড়াও সেখানে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এছাড়া, স্থানীয় মণ্ডল পরিবারের গৃহদেবতা দামোদরের আটচালা মন্দিরটি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ হয়েছে টেরাকোটা-সজ্জা। অনুরূপ কাঁড়ার পাড়ায় সীতানাথের আটচালা মন্দিরেও বেশ কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায় এবং উৎসর্গলিপি অনুসারে মন্দিরটি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

গ্রামের মধ্যপাড়ায় মল্লিক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর জীউর আটচালা মন্দিরটি ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং এটির দেওয়ালেও নিবদ্ধ হয়েছে নানা বিষয়ক টেরাকোটা অলংকরণ। কাছাকাছি হাজরা পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধর জীউর নবরত্ন মন্দিরটির দেওয়ালে পোড়ামাটির ভাস্কর্য অলংকরণের বদলে পঙ্খ পলস্তারায় উৎকীর্ণ বিবিধ নকশা দেখা যায়। গ্রামের মল্লিক পরিবারের গৃহদেবতার রথযাত্রা উপলক্ষে আযাঢ় মাসে ৯ দিন ব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে।

ঝোড়হাট ঃ আন্দুল রেল স্টেশন থেকে প্রায় ২ কি.মি. দূরবর্তী শাঁকরাইল থানার অন্তর্গত ঝোড়হাট গ্রাম। এ গ্রামে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়া প্রভু জগবন্ধু কলেজ নামে একটি ডিগ্রী কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের প্রথমদিকে এ গ্রামের কবি হরিদেব শর্মা বা দ্বিজ হরিদেব রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল নামে দুটি মঙ্গলকাব্য রচনা করেন।

ডিহিভুরশুট ঃ উদয়নারায়ণপুর ডিহি-ভুরশুট পিচের সড়কে উদয়নারায়ণপুর থেকে ৬ কি.মি. উত্তরে, উদয়নারায়ণপুর থানার এলাকাধীন ডিহিভুরশুট গ্রাম। দক্ষিণ রাঢ়ের এই ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট গ্রাম একদা সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের ভারতবিখ্যাত দার্শনিক এবং 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীধরাচার্য এখানের অধিবাসী ছিলেন। দামোদর তীরবর্তী এই স্থানটি একদা ব্যবসা বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল এবং মোগল আমলে এটি পরগণার এক কেন্দ্রস্থল (ডিহি) হিসাবে গণ্য হয়। বর্তমানে এখানে তেমন কোন পুরাকীর্তি না থাকলেও স্থানীয়ভাবে পুষ্করিণী খননের সময় নানা পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া, গ্রামের মধ্যপাড়ায় মাটির তলায় প্রাপ্ত বাঁধানো ইটের দেওয়াল, প্রাচীনকালের পাতকুয়ার গোলাকার বেড় এবং ইট বিছানো রাস্তার নিদর্শন দেখে মনে হয়, এ এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ চালালে বহু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হতে পারে।

নবাসন ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ঘোড়াঘাটা স্টেশন থেকে পিচের সড়কে প্রায় ১ কি.মি. উত্তরে এবং ৬ নং জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত বাগনান থানার অন্তর্গত নবাসন গ্রাম। স্থানীয় গ্রাম পুনর্গঠন ও সমাজসেবা অনুশীলন কেন্দ্র 'আনন্দ নিকেতন' কর্তৃক পরিচালিত পুরাতত্ত্ব ও লোকশিল্পের মিউজিয়াম 'আনন্দ নিকেতন' কীর্তিশালা' এখানকার এক বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। এখানে প্রাচীন পোড়ামাটির ফলক, মৃৎপাত্র, মূর্তিকা ও প্রস্তর মূর্তি, মন্দির সজ্জায় ব্যবহৃত পোড়ামটির ফলক এবং লোকশিল্পের নানা দ্রব্যসম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্যান্য দিন সাধারণ দর্শকদের জন্য বিনা প্রবেশমূল্যে কার্যকালীন সময়ে খোলা থাকে।

নিজবালিয়া ঃ হাওড়া থেকে হাওড়া-মুন্সীর হাট পিচের সড়কে প্রায় ২৪ কি.মি. দূরত্বে পাতিহাল হয়ে দক্ষিণে পিচের সড়কে ১ কি.মি. আসার পর জগৎবল্লভপুর থানার এলাকাধীন এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম নিজবালিয়া।

দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। কিংবদন্তী যে, এখানকার কোন এক ভূস্বামী রাজা রণসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই দেবী সিংহবাহিনী, যিনি বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। সিংহবাহিনীর অষ্টভুজা বিগ্রহটি কাঠের এবং মন্দিরটি আটচালা হলেও মন্দির সংলগ্ন জগমোহনটি চারচালা রীতির। মন্দিরের মধ্যে কষ্ঠিপাথরের নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি একান্তই অভিনিবেশযোগ্য।

এ মন্দিরের অল্প দক্ষিণে, 'টেরাকোটা' অলংকৃত আর একটি আটচালা শিবমন্দিব দেখা যায়, যেটি প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এছাড়া, সিংহবাহিনী মন্দিরের উত্তর-পূর্বে, বালিয়াবাজার এলাকায়, স্বয়ম্ভু শিব পিপুলেশ্বর-এর সপ্তরথ শিখর-দেউলটি স্থাপত্য বিচারে উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে অনুমান।

পাতিহাল ঃ জগৎবল্লভপুর থানা কেন্দ্র থেকে দক্ষিণে প্রায় দেড় কি.মি. দূরবর্তী এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম পাতিহাল। এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত তালাচাবি তৈরীর এক কারখানা স্থাপিত। এছাড়া, এখানের বিভিন্ন পাড়ায় স্থাপিত বেশ কিছু মন্দির ও রাসমঞ্চ এখানের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মজুমদার পাড়ার মন্দিরতলা এলাকায় দুটি আটচালা শিবমন্দির স্থাপত্য নিরিখে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে অনুমান। এছাড়া মজুমদার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে বেশ কিছু টেরাকোটা অলংকরণ দেখা যায়।

অন্যদিকে সাহাপাড়ায় মণ্ডল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি রাসমঞ্চ ছাড়া, গ্রামের মহেশতলায় চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কালীনাথ জীউ-এর একটি আটচালা মন্দির, স্থাপত্য বিচারে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে অনুমান। অন্যত্র রায়পাড়ার দোলমঞ্চটি যে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত তা এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

গ্রামের দক্ষিণে নস্কর দিঘিটিতে একদা পঙ্কোদ্ধারের সময় একটি বাঁধানো ঘাটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে রক্ষাকালীর বাৎসরিক পূজো উপলক্ষে এক বিরাট মেলা বসে। এছাড়া প্রতিবৎসর দোলের সময় রায়পাড়ায় দোল উপলক্ষে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পিছলদহ ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-কমলপুর পিচের সড়কে, কমলপুর থেকে প্রায় ৩ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে, শ্যামপুর থানার অন্তর্গত পিছলদহ গ্রাম। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ডি-ব্যারোজ এবং ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের গ্যাস্টলডির মানচিত্রে 'পিকল্দা' নামে স্থানের উল্লেখ থাকায় এ স্থানটি যে একদা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল তেমনই বোঝা যায়। তাছাড়া, কিংবদন্তী যে, চৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে এখানে আড়াই দণ্ডকাল বিশ্রাম করেছিলেন। এছাড়া, এখানে এক বট, অশ্বত্থ ও তমাল গাছের তলায় পোড়ামাটির মুণ্ডরূপে দক্ষিণ রায় নামে পূজিত দেবতার মূর্তিটি বেশ অভিনব। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে এই দেবতার বার্ষিক উৎসব হয়।

এখানে মুখোপাধ্যায় পরিবারের পূজিত বারাহীচণ্ডী নামে পাথরের মূর্তিটি সম্ভবতঃ মস্তকবিহীন প্রাচীন এক নৃসিংহমূর্তি, যেটিকে ভাস্কর্য শৈলীর নিরিখে পালযুগের বলে সনাক্ত করা যেতে পারে। দেবীর কক্ষের বাইরের চত্বরে ভাস্কর্যযুক্ত যে পাথরের চৌকো খণ্ডটি পড়ে আছে তা দেখে অনুমান যে, সেটি কোন পাথরের মন্দিরের অংশবিশেষ ছিল। সমস্ত স্থানটি এখনও প্রাচীন খোলামকুচিতে পূর্ণ। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হলে কোন প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতে পারে।

পেঁড়ো ঃ হাওড়া-পেঁড়ো পিচের সড়কে উদয়নারায়ণপুর থানার এলাকাধীন পেঁড়ো গ্রাম। আঠারো শতকের প্রখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁরই জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিবমন্দির এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। এখানে পাশাপাশি দুটি মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমের মন্দিরটি যজ্ঞেশ্বর শিবের দালান রীতির দেবালয় এবং পুবেরটি টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত বিশ্বেশ্বর শিবের আটচালা মন্দির, যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ। তৃতীয় মন্দিরটি হরিশ্বর শিবের আটচালা মন্দির, যার সম্মুখ-

ভাগ পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত এবং সেটি লিপিফলক অনুযায়ী ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

এছাড়া, এখানকার গড়বাড়ি এলাকায় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন শিখর দেউলটির বিগ্রহ হল, শ্রীধরজীউ ও রামেশ্বর শিব। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক।

বাউড়িয়া ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বাউড়িয়া স্টেশন থেকে দক্ষিণে প্রায় ২ কি.মি. দূরবর্তী পিচের সড়কে থানার সদর বাউড়িয়া। ভাগীরথী তীরবর্তী সংশ্লিষ্ট বাউড়িয়া, ফোর্ট গ্লস্টার ও বুড়িখালী এই তিন মৌজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এখানকার বাউড়িয়া শিল্প কারখানা।

এখানের ফোর্ট গ্লস্টার এলাকায় অতীতে কোন দুর্গ ছিল কিনা তা জানা না গেলেও এই এলাকার চতুর্দিকে যে একসময় পরিখা যুক্ত ছিল তার কিছু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এই এলাকায় জাহাজ নির্মাণ থেকে কাপড় কল, মদ চোলাই ও লোহা ঢালাই কারখানা, কাগজ কল এবং তেল কলও নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত নানাবিধ শিল্পকারখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বাউড়িয়া কটন মিল, ফোর্ট গ্লস্টার নর্থ জুট মিল, ফোর্ট গ্লস্টার নিউ জুট মিল এবং ফোর্ট গ্লস্টার ক্যেবল ফ্যাক্টরি। উল্লেখ্য যে, বাউড়িয়া কটন মিল বর্তমানে যে স্থানে অবস্থিত, সেটি পূর্বে ছিল ডাচদের অধিকারে, পরে এটি ইংল্যাণ্ডের ইউনাইটেড কোম্পানি অফ্ মার্চেন্টস্-এর দখলে চলে যায়। এখানের বাউড়িয়া কটন মিলটি ভারতে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম কাপড়ের কল, যেটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

বাগনান ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া থেকে বাগনানের দূরত্ব ৪৬ কি.মি. এবং হাওড়া থেকে জাতীয় সড়ক ৬ নং পিচের সড়কেও এখানে আসা যায়। এখানকার বাগনান উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া, এখানে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও বাগনান গার্লস স্কুল নামে দুটি বালিকা বিদ্যালয় এবং বাগনান কলেজ নামে একটি ডিগ্রী কলেজও স্থাপিত হয়েছে। কবি মোহিতলাল মজুমদার এই শতাব্দীর চারের দশকে বেশ কয়েকবৎসর এখানকার বাসিন্দা ছিলেন। বাগনানের উপকণ্ঠে স্থাপিত সফরদান পীরের মাজারটি খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের প্রাচীন। আষাঢ় মাসে স্থানীয় নন্দী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রথযাত্রায় এখানে একদিনের মেলা বসে। কয়েক বৎসর পূর্বে রেল স্টেশনের সন্নিকটে মাটি খোঁড়ার সময় কষ্টিপাথরের নির্মিত পালযুগের একটি ত্রিভঙ্গভঙ্গিমার বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়।

বালী ঃ হাওড়া স্টেশন থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে ৯.৬ কি.মি. উত্তরে বালী থানার সদর বালী শহর। পূর্ব রেলপথের বালী রেল স্টেশনে নেমেও এখানে আসা যায়। বালী একদা এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী স্থান হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বালী গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া রেনেলের কৃত মানচিত্রেও এ স্থানটি চিহ্নিত। বর্তমানে এলাকাটি বালী পৌরসভার অন্তর্গত। এ শহরে একটি ডিগ্রী কলেজ, ১২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি সংস্কৃত টোল এবং চারটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এখানে একটি চিনি

তৈরীর কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে শিল্পকেন্দ্রিক শহর গড়ে ওঠে, যেটি পরবর্তীকালে একটি কাগজ কলে রূপান্তরিত হয় এবং সেই কলে উৎপাদিত কাগজ বালীর কাগজ নামে পরিচিত হয়।

এখানের বেশ কয়েকটি পুরাকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কল্যাণেশ্বরতলায় প্রতিষ্ঠিত স্বয়ম্ভু কল্যাণেশ্বর শিবের আটচালা মন্দির যা আঠার শতকের স্থাপত্যকীর্তি বলেই অনুমান করা যায়। এছাড়া, বিবেকানন্দ সেতুর নীচে পুরানো বাঁধাঘাটে যে দুটি মন্দির দেখা যায়, সেগুলি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে যে নির্মিত, তা ঐ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায়। এর দক্ষিণ দিকে বাঁধাঘাটে স্থাপিত দুটি আটচালা মন্দির ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। বিগত ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় ঘোষপাড়ার ষষ্ঠীতলায় একটি সতীদাহ স্মারক চিহ্নযুক্ত পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়, যেটিতে উৎকীর্ণ লিপি থেকে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৮৫ বঙ্গাব্দে এখানে সহমরণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বেতড় ঃ শিবপুর থানার অর্ন্তগত বর্তমানের বেতড় এক প্রাচীন স্থান। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রপট্টে, বর্ধমানভুক্তির অর্ন্তগত বেতড্ড-চতুরক-এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে উক্ত বেতড্ড-চতুরক বর্তমান এই বেতড় নামক স্থান এবং এরই নামানুসারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় পনেরো শতকের শেষদিকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসাবিজয়' কাব্যেও বেতড় এবং স্থানীয় লৌকিক দেবী বেতাইচন্ডী সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেজন্য পরবর্তীকালে এই এলাকার এক অংশ বেতাইতলা নামে পরিচিত হয়। সিজার ফ্রেডারিক নামে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মধ্যভাগে বেতড় পরিদর্শন করে লিখেছিলেন যে, শীতের সময় পর্তুগীজদের বাণিজ্যের দৌলতে এখানে এক বিরাট বাজার বসতো। ডি-ব্যারেজ (খ্রীঃ ১৫৫২ ১৬১৩), ব্রায়েভ (খ্রীঃ ১৬৪৫-১৬৫০) এবং রেনেলের (খ্রীঃ ১৭৭৯-১৭৮১) তৈরী মানচিত্রে বেতড়-এর উল্লেখ থাকায় এলাকাটির সে সময়ের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু বর্তমানে সিদুঁরলিপ্ত বেতাইচন্ডীর এক সাধারণ মন্দিরে অবস্থান ছাড়া বেতড়ের পূর্বগৌরবের অন্যান্য সব স্মৃতিচিহ্নই আজ বিলুপ্ত।

বেলুড় ঃ হাওড়া রেল স্টেশন থেকে বালীখালগামী বাসে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, অথবা পূর্ব রেলপথের বেলুড় স্টেশনে নেমে বালী থানার অর্ন্তগত বেলুড় -এ পৌছানো যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ এবং সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরটির বিশাল স্থাপত্যশৈলী একান্তই অভিনব, যা সর্বভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যকলার প্রতিরূপস্বরূপ এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া, বেলুড়মঠ প্রাঙ্গণে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি সৌধ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করে একটি সংগ্রহশালা এখানের এক বড় আকর্ষণ।

মাজু ঃ জগৎবল্লভপুর থানার অর্ন্তগত মাজু নামের তিনটি গ্রাম দেখা যায়। যথা দক্ষিণ মাজু, মধ্য মাজু ও মাজু ক্ষেত্র। দক্ষিণ মাজু গ্রামের কোলে পাড়ায় অলংকরণযুক্ত দামোদরের আটচালা মন্দিরটি স্থাপত্য বিচারে আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান। মধ্য মাজু গ্রামটির বসু পাড়ায় পাশাপাশি তিনটি মন্দিরের মধ্যে নীলকণ্ঠ মহাদেবের আটচালা

মন্দিরটি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। অন্যদিকে, মাজু ক্ষেত্র গ্রামটির দ্বাদশমন্দির তলায় বারোটি আটচালা শিব মন্দির ছাড়া গ্রামের ধলে পাড়ায় বুড়ো শিবের আর একটি আটচালা মন্দির দেখা যায়। শেষোক্ত মন্দিরটি পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত এবং ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এছাড়া ঐ গ্রামের কুম্ভকার পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত আটচালা শিবমন্দিরটি ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

মাহিয়াড়ী ঃ ডোমজুড় থানার এলাকাধীন মাহিয়াড়ী প্রাচীন সরস্বতীর দক্ষিণ তীরবর্তী গ্রাম এবং মৌড়িগ্রাম রেল স্টেশন থেকে পিচের সড়কে এখানের দূরত্ব প্রায় ৩ কি.মি.। এখানে রয়েছে দুটি হাইস্কুল, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহসহ একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, একটি সুতোকল, দৈনিক বাজার ও হাসপাতাল। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে নির্মিত প্রায় ৫০ কি.মি. উচ্চতাসম্পন্ন একটি সিমাফোর স্তম্ভ এখানকার এক অভিনব পুরাকীর্তি। এখানকার কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন্দ ও শ্মশানেশ্বর নামে দুটি আটচালা শিবমন্দির শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। এই পরিবারের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের রাস উৎসব উপলক্ষে ১৫ দিন ব্যাপী এখানে এক মেলা বসে।

মেল্লক ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দেউলটি স্টেশন থেকে শরৎচন্দ্র রোড ধরে প্রায় ২ কি.মি. দূরত্বে বাগনান থানার মেল্লক গ্রাম। মণ্ডলঘাট পরগনার সুবিখ্যাত ভূস্বামী মুকুন্দ -প্রসাদ রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল জীউর আটচালা মন্দিরটি এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরের সম্মুখভাগে সামান্য 'টেরাকোটা' অলংকরণ ছাড়া যে প্রতিষ্ঠালিপিটি ছিল তা থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরের দক্ষিণের দালানে কষ্টিপাথরের নির্মিত একটি বিষ্ণুবাসুদেব মূর্তি রক্ষিত।

গভীর পরিতাপের বিষয়, ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক মন্দিরটি সংস্কারের সময় সামনের অংশ ভেঙ্গে পড়ে। পরবর্তীকালে এটিকে সংস্কারযোগ্য করা হলেও এর পূর্বতন সৌকর্য বহুল পরিমাণে নষ্ট হয়েছে।

রসপুর ঃ আমতা থেকে দামোদরের পুবতীর বরাবর নদী বাধেঁর কাঁচা বাস্তায় প্রায় ৪ কি.মি. উত্তরে আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রাম। এ গ্রামে রয়েছে বিগত উনিশ শতকে স্থাপিত একটি ছেলে ও একটি মেয়েদের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। গ্রামের পূর্বপাড়ায় বুড়ো শিবের আটচালা মন্দিরটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া, গ্রামের গড়চণ্ডীতলায় গড়চণ্ডীর মূর্তিটি নিমকাঠের তৈরী, যা কাঠখোদাই কাজের এক অপূর্ব নিদর্শন। এ মন্দিরে রক্ষিত কষ্টিপাথরের একটি সুন্দর মনসামূর্তি পুরাতত্ত্ব হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার রায় পরিবারের সতের শতকের কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় শিবায়ন কাব্যের রচয়িতা এবং তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে রাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্মিত প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হলে বিগ্রহটি এক দালান মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়।

রাউতাড়া ঃ জয়পুর থানার অর্ন্তগত এই গ্রামটি ঝিখিরা গ্রামের সংলগ্ন গ্রাম। এখানকার ঘোষপাড়ায় অবস্থিত ঘোষ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত সীতারাম জীউর আটচালা মন্দিরটি পোড়ামাটির অলংকরণ শোভিত এবং মন্দিরটি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। স্থানীয় রায় পরিবারের স্থাপিত পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত আটচালা রীতির দামোদর মন্দিরটি ১৭৬২

খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং এই দেবতার কাঠের রথটিও ১৮৫৩ সালে নির্মিত। এছাড়া, কেরাণীবাড়ির রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদর জীউর আর একটি আটচালা মন্দির ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যে নির্মিত, তা মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

এছাড়া, আমতা-ঝিখিরা সড়ক সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত মানিক পীরের দোচালা রীতির মানিক পীরকে দরগাটি কেরানীবাড়ির রায় পরিবারের রামজয় রায় কর্তৃক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রতিষ্ঠিত তা দরগায় উৎকীর্ণ এক সংস্কারলিপি থেকে জানা যায়। পীরের ২রা বৈশাখ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি বড় মেলা বসে। কাছাকাছি বহু গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নরনারী মানিক পীরকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর কাছে মানত করেন। সেদিক থেকে এই পীরের দরগাটি স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক স্থায়ী মিলন সেতু -রূপে বিরাজ করছে।

শাঁকরাইল ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের আন্দুল স্টেশন থেকে প্রায় ৩ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং শাঁকরাইল স্টেশন থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৩ কি মি. দূরত্বে পিচের সড়কে এখানে আসা যায়। সরস্বতী ও ভাগীরথীর সংযোগস্থলে অবস্থিত থানার সদর এই শাঁকরাইল গ্রামটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বিভিন্ন কাগজপত্রে উল্লিখিত হয়েছে। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগাষ্ট তারিখের ডাইরীতে জোব চার্নক এবং ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন গোল্ডসবরো এই পল্লীটির উল্লেখ করেছেন। রেনেলের মানচিত্রেও এস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়ের হেষ্টিংসের সমসাময়িক স্থানীয় জমিদার মদন রায় এখানকার দেবী বিশালাক্ষীর আটচালা মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। দেবীর বাৎসরিক উৎসব হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। এছাড়া স্থানীয় বড়পীরের আস্তানায় মাঘ মাসে মেলা বসে থাকে।

শিবগঞ্জ ঃ বাগনান রেল স্টেশন থেকে বাগনান-শিবগঞ্জ পিচের সড়কে শ্যামপুর থানার এলাকাধীন শিবগঞ্জ গ্রাম। এখানে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এক প্রাচীন মসজিদ এখানকার এক পুরাকীর্তি। কিংবদন্তী যে, বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কাশেম খাঁ নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ পুরাকীর্তিটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন খুবই জীর্ণদশা।

সামতাবেড়িয়া ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দেউলটি স্টেশন থেকে উত্তরে পিচের সড়কে প্রায় ২ কি.মি. দূরত্বে বাগনান থানার অর্ন্তগত মেল্লক মৌজার উত্তর অংশে অবস্থিত সামতাবেড়িয়া গ্রাম। এই গ্রামেই ছিল ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীনিবাস। এছাড়া, এ গ্রামের বাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গৃহপ্রাঙ্গণে রক্ষিত একটি ক্লোরাইট পাথরের বিষ্ণুমূর্তি ভাস্কর্যশৈলী অনুসারে খ্রীষ্টীয় বারো-তের শতকের বলেই অনুমান।

সুলতানপুর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর পিচের সড়কে বেলপুকুর হাটের প্রায় দেড় কি.মি. পুবে শ্যামপুর থানার এলাকাধীন সুলতানপুর গ্রাম। স্থানীয় মল্লিকপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত খটিয়াল শিবের চারচালা মন্দিরটি ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, যা হাওড়া জেলার প্রাচীনতম এক দেবালয়। মন্দিরটির সম্মুখভাগের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রস্ফুটিত ফুল ও পদ্মের অন্তবর্তী স্থানে রাম কর্তৃক মারীচ বধের দৃশ্য।

হরিনারায়ণপুর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর পিচের সড়কে মুগকল্যান থেকে পুবে প্রায় ২ কি.মি. দূরবর্তী বাগনান থানার এলাকাধীন হরিনারায়ণপুর গ্রাম। কয়েক বৎসর পূর্বে জেলার প্রত্নতত্ত্ব ও লোকশিল্পের সংগ্রহশালা আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে এখানে গুপ্ত-পাল-সেন যুগের বেশ কয়েকটি প্রাচীন মৃৎপাত্র, মূর্তিকা, পোড়ামাটির সীলমোহর ও পাথরের মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কার করা হয়। এছাড়া, এখান থেকে খ্রীষ্টীয় বার-তের শতকের প্রাপ্ত দুটি বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি বর্তমানের শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী কলাভবনে সংরক্ষিত হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত পুরাতত্ত্ব সম্পদের নিরিখে বোঝা যায়, প্রাচীন কোন জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখানকার মাটির তলার প্রোথিত আছে, যা পুরাতাত্ত্বিক উৎখননের সাহায্যে বিশদ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

হাওড়া শহর ঃ হাওড়া শহর বর্তমানে হাওড়া পৌর নিগম এলাকার অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টীয় সতের শতকের শেষে কলকাতা যখন গড়ে ওঠেনি, তারও আগে সুলতানী ও বাদশাহী আমলের প্রসিদ্ধ শহর-বন্দর ছিল বেতড় ও শালিখা। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও বেতড় ও শালিখার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, বেতড় ও শালিখা সে সময় বস্ত্রশিল্পের এক বিরাট কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় আঠার শতকে দিল্লীর বাদশাহ ফারুকসায়র ইংরেজদের যে সব মৌজার পত্তনি দান করেন সেগুলি হল শালিখা, হাড়িড়্যা, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর ও বেতড়। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর ভীতি প্রদর্শনের ফলে স্থানীয় জমিদাররা ইংরেজদের এ মৌজাগুলি ইজারা দিতে অস্বীকৃত হয়। তবে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি যখন হাড়িড়্যা মৌজায় রেল স্টেশনের পত্তন করেন. তখন থেকেই সে মৌজার নাম লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে হাওড়া নামে রূপান্তরিত হয়। বিগত ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন কলকাতা পরিদর্শনকালে উল্লেখ করেছেন, কলকাতার অপর
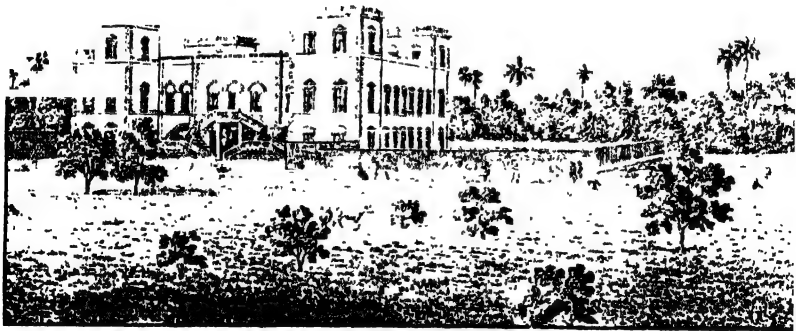
সেকালের অরফ্যান সোসাইটির স্কুল, বর্তমানে হাওড়া জেলা কালেকটরের কার্যালয়। উইলিয়ম বেলী কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র, ১৭৯৪

পারে রয়েছে জাহাজ সারাইয়ের ডক ও আর্মেনিয়ানদের সুসজ্জিত এক মনোহর বাগান। হাওড়া শহরের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এক সময়ে মগদস্যু দমনে

ভাগীরথী তীরবর্তী স্থানে মোগলরা সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে যে দুর্গটি নির্মাণ করে, সেটির পরিচয় হয় থানা মাকুয়া নামে, যার অবস্থান ছিল বর্তমান বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষের কার্যালয়ের কাছে। এই থানা মাকুয়া কেল্লার উত্তর প্রান্তে কর্ণেল রবার্ট কিডের উদ্যোগে মাকুয়া দুর্গসহ ২৭০ একর জায়গা জুড়ে যে বিখ্যাত বাগানটি গড়ে ওঠে সেটিই আজকের ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের সংলগ্ন শিবপুর এলাকায় আঁদুলের রাজা রামচন্দ্র রায় মন্দিরতলায় যে শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন, তা থেকেই এই এলাকার নাম হয় শিবপুর। কাছাকাছি ভড়পাড়ায় চারমন্দিরতলায় আঁদুলরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাশাপাশি দুটি নবরত্ন ও দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির। নিকটবর্তী কাজিপাড়ায় 'বড়া মসজিদ' নামে পরিচিত এক প্রাচীন মসজিদ এখানকার এক পুরাকীর্তি। বর্তমান হাওড়া এলাকায় ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এক মদ চোলাই কেন্দ্রের ইমারতসহ স্থানটি ইজারা নেন মিঃ লোভেট সাহেব। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মূল্যে অরফ্যান সোসাইটিকে বিক্রী করে দেওয়া হয়। পূর্বে কথিত মদ চোলাইয়ের কুঠিবাড়িটি আজকের জেলা কালেক্টারের অফিসবাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত।

স্বভাবতই নদীতীরবর্তী হাওড়া শহর ও শালিখায় ইংরেজদের কেন্দ্রীভূত বসতি গড়ে ওঠে। তাই ধর্মীয় উপাসনার জন্য হাওড়ার পৌর এলাকায় প্রাচীনতম গির্জাটি ১৮২১ সালে কুলেন প্লেসে প্রতিষ্ঠা করেন মিঃ স্ট্যাথাম। পরে এটিকে সে সময়ের ডবসনস্ লেন ও কিংস লেনের সংযোগস্থলে উঠিয়ে এনে 'গথিক স্থাপত্য' অনুসরণে একটি নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয়। এছাড়া, কুলেন প্লেসেও নির্মাণ করা হয় একটি বৃহদায়তন রোম্যান
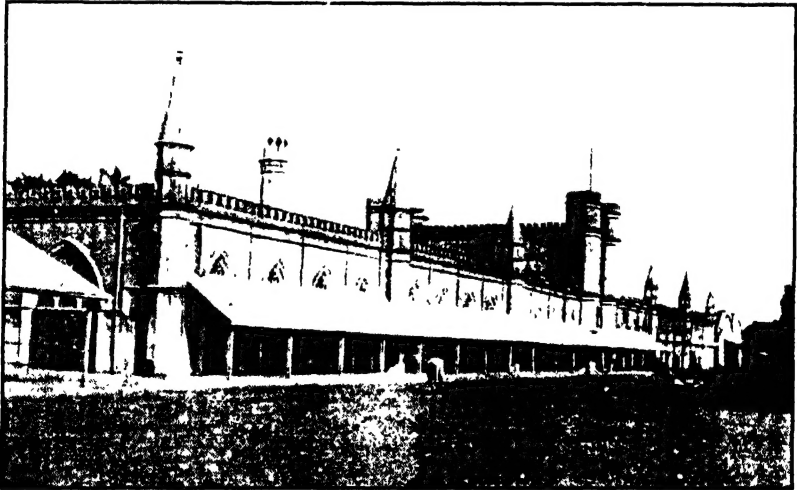
সেকালের বিশপ কলেজ, বর্তমানে বি. ই. কলেজ

ক্যাথলিক গির্জা। কলকাতার প্রথম বিশপ, মিডলটনের উদ্যোগে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে যে বিশপ কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, সেটিই বর্তমানের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওই কলেজের প্রাঙ্গণেই নির্মাণ করা হয় সেন্ট টমাস গির্জা।

কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগস্থাপনের জন্য ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া ব্রীজ নামে যে ভাসমান সেতুটি নির্মাণ করা হয়, তা পরবর্তীকালে উঠিয়ে দিয়ে পরিবর্তে যে ক্যান্টিলিভার সেতুটি নির্মাণ করা হয় সেটির নামকরণ করা হয় হাওড়া ব্রীজ, যা আজকের রবীন্দ্র সেতু। এছাড়া কলকাতা-হাওড়া সংযোগের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়েছে বিদ্যাসাগর সেতু।

অন্যদিকে হাওড়া শহরে প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন এক দেবতা হলেন পঞ্চাননতলা রোডের পঞ্চানন্দ। হাওড়া শহরের নদীতীরবর্তী স্থানে আঠার শতক থেকেই দড়িশিল্পের কারখানা এবং জাহাজ সারাইয়ের ডক ইত্যাদি নির্মিত হয়। সেজন্য বিশপ হেবর সাহেব ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া শহর সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন যে, প্রধানতঃ জাহাজ নির্মাণ কারিগরদের বাসস্থান। পরবর্তীকালে লোহালক্কড়ের নানাবিধ কারখানা স্থাপনের কারণে এ শহরের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারতের শেফিল্ড'। একসময় বাঁধাঘাট ও শিবপুরে যে ট্রামগাড়ি চলতো বর্তমানে তা বিলুপ্ত। একই সঙ্গে একদা হাওড়ার তেলকলঘাট ও পরে কদমতলা থেকে মার্টিন কোম্পানির যে ছোট রেল চলতো আমতা, শিয়াখালা ও চাঁপাডাঙ্গা অভিমুখে, বর্তমানে সেগুলিও পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

হাফেজপুর ঃ হাওড়া-মুন্সীরহাট পিচের সড়কে মুন্সীরহাটের নিকটবর্তী জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার হাফেজপুর গ্রাম। এই গ্রামে মধ্যযুগের আরবী-ফারসি প্রভাবিত বাংলা পুঁথি সাহিত্যের জনক, কবি শাহ সৈয়দ গরীবুল্লাহ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন। এই কবির লেখা যে পাঁচটি কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা হল জঙ্গনামা, সোনাভান, আমীর হামজা, ইউসুফ-জোলেখা ও সত্যপীরের পুঁথি। কবির লেখা যেসব পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় তার রচনা বাংলায় রচিত হলেও, অক্ষরগুলি ছিল ফারসি হরফের। মুন্সীরহাট থানার অন্তর্গত নাইকুলি গ্রামে এই কবির মাজার শরীফ আছে। সেখানে প্রতিবৎসর ১১ই কার্তিক মহাপ্রয়াণ দিবসে উরুস উৎসব হয়ে থাকে।

[হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি সম্পার্কিত বিশদ বিবরণের জন্য বর্তমান লেখক কর্তৃক রচিত 'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি' (পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃপ্রত্নতত্ত্ব বিভাগ) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য]

গ্রন্থপঞ্জী

ও' ম্যালী, এল. এস. এস এবং চক্রবর্তী-মনোমোহন বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স-হাওড়া, ১৯০৯

কাব্যস্মৃতিতীর্থ, হরিদাস—'খড়ি-অপবার্তা, ১৩২১

গাঙ্গুলী, কল্যাণকুমার—হাওড়া ইন পার্সপেক্টিভ-ট্র্যাডিশন অ্যাণ্ড কালচার, ১৯৮৩

গুপ্ত, অম্বিকাচরণ—হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়, ১৯১৪

ঘোষ, দেবপ্রসাদ—স্টাডিস্ ইন মিউজিয়ম অ্যাণ্ড মিউজিওলজি ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৮

ঘোষ, বিনয়—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১৩৬৩

ঘোষ, যামিনীমোহন—মগ রেড়ার্স ইন বেঙ্গল, ১৯৬০

চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ—সংক্ষিপ্ত পল্লীচিত্র, ১৩২০

চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত—পশ্চিমবাংলার গড় কেল্লা দুর্গ, ১৯৯৬

চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর—বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, ১৯৯১

ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক—হাওড়া, ১৯৯৫

দত্ত, অক্ষয়কুমার—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২য় ভাগ), ১৮৮৩

দত্ত, কালিদাস—'পৌণ্ড্রবর্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তি' (প্রবন্ধ), সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪১

পাল, বসন্তকুমার—স্মৃতির অর্ঘ্য, ১৮৮০

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ—'আনন্দনগরী, কিন্তু হাওড়ার বস্তিতেই' (প্রবন্ধ) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩.১২.১৯৮৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার—দেখা হয় নাই, ১৩৮০

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার—হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৯০

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র—বালীর ইতিহাসের ভূমিকা, ১৩৪৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতাংশুমোহন—শতাব্দীর পরিক্রমায় বালী গ্রামের ইতিকথা, ১৩৯৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র—হাওড়া জেলার ইতিহাস, ১৯৯৯

ব্যানার্জি, অমিয়কুমার—হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ১৯৭২

ব্যানার্জি, চন্দ্রনাথ—অ্যান অ্যাকাউন্ট অভ্ হাওড়া, পাষ্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট, ১৮৭২

বোনার্জি, জে—হাওড়া সিভিক কম্প্যানিয়ন, ভল্যুম ১, ১৯৫৫

ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র—'ভূরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ' (প্রবন্ধ), প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫৯

মতিলাল, অনুপ—'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, হাওড়া জেলা পরিষদ ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা' (প্রবন্ধ), হাওড়া জেলা পরিষদ শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, ১৯৮৬

থান্না, শিবেন্দু—জগৎবল্লভপুরঃ জনপদ কথা, ২০০০

মিত্র, অশোক (সম্পাদিত)—পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (২য় খণ্ড), ১৯৬৮

মিশ্র, নলিনচন্দ্র—বালী গ্রামের ইতিহাস, ১৯৮৩

মুখার্জি, অলোককুমার—হাওড়া ঃ অ্যা স্টাডি ইন আরবানাইজেশন, ১৯৯২

মৈত্র, কালিদাস—বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে, ১২৬২

ম্যাককাচ্চন, ডেভিড— লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস অফ বেঙ্গল, ১৯৭২,

– 'নোটস্ অন সাম টেম্পলস্ ইন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট' (প্রবন্ধ), সেনসাস হ্যাণ্ডবুক-হাওড়া, ১৯৭০

রক্ষিত, শৈবালকান্তি—হাওড়া জেলা গঠনের ইতিহাস, ১৯৯৯

রায়, নীহাররঞ্জন—বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ১৩৫৯

রায়, পাঁচুগোপাল—রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ও রসপুর রায় বংশের ইতিকথা, ১৯৬৪

রায়, বি. (সম্পাদিত)—ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস্ হ্যাণ্ডবুক, ১৯৬১

লাহিড়ী, দুর্গাদাস—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, দ্বাদশ অধিবেশন, ১৩২৭

সাঁতরা, তারাপদ—হাওড়া জেলার লোকউৎসব, ১৩৬৯

— 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি সাধনা ও বাংলার সংগ্রহশালা' (প্রবন্ধ), 'পশ্চিমবঙ্গ', ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭২

'আর্কিঅলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন অ্যাট দি ভ্যালী অভ কানা দামোদর' (প্রবন্ধ), 'হিউম্যান ইভেন্টস্', জুন ১৯৬৯

— বাংলার দারু ভাস্কর্য, ১৯৮০

— মন্দির লিপিতে বাংলার সমাজচিত্র, ১৯৮৩

— বাংলার পোড়ামাটির ভাস্কর্য ঃ সমাজ আলেখ্য (প্রবন্ধ) লোকশ্রুতি, সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

— হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি, ১৯৭৬

— শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য, ১৯৬৯

— ছড়া-প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ, ১৯৮১

— উলুবেড়ের আদিপর্ব, ১৯৯৬

— রূপনারায়ণ উপকূলে প্রাচীন জনপদ ঃ হরিনারায়ণপুর ও বাছরী (প্রবন্ধ), ডুলুং, আশ্বিন ১৪০৪

— হাওড়া ঃ পাঁচশো বছর ধরে (প্রবন্ধ) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩.১২.৮৯

সিংহ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ—দি হিসট্রি অভ্ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫), ১৯৬৭